প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৪

মুদ্রাকর :
শ্রীমদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাংলা সাহিত্যের
নবজাগরণ ও রামমোহন

BANGLA SAHITYER NABAJAGARAN O RAMMOHAN

by

Shri Bhudeb Chaudhuri

পূজনীয়

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী

[যাঁর চরণতলে বসে বাঙালির নবজাগরণের আলোক-শিখা
প্রথম দেখতে শিখেছিলাম]

শ্রীচরণকমলেষু।

সূচী

কথামুখ

রামমোহন রায় (১৭৭৪[১]—১৮৩৩ খ্রীঃ) তাঁর জীবিতকাল হতেই বাংলাদেশের এক প্রধান বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। বস্তুত ইতিহাসের নির্মাতারা প্রথমে তাই হয়ে থাকেন।

ইতিহাস নিঃসন্দেহে তথ্য-ভিত্তিক, কিন্তু কখনোই তথ্যমাত্র-উপজীবী নয়। তথ্যের যথাযথ মূল্যায়ন ইতিহাসের প্রধান দায়িত্ব ; তার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন নির্ভুল মূল্যমানের উদ্ভাবন। রবীন্দ্রনাথও অনেকটা এই কথাই বলেছিলেন,[২]—"তথ্য ইংরেজিতে যাহাকে ফ্যাক্ট কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়।" কাজটা সুসাধ্য নয়। নির্ভুল তথ্যের নিরাকরণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা রাখে ; ফলে অনেক সময়েই তা সম্পূর্ণ যথাযথ হয় না।—একটি ঘটনা সম্পর্কে দু'জন প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণে পার্থক্য প্রায়ই থেকে যায়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি [personal error] এড়িয়ে তথ্যবস্তুর একটা সাধারণ সর্বগ্রাহ্য কাঠামো আয়ত্ত হয়ে যাবার পরেও আসল সমস্যা থেকেই যায় তার থেকে 'যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার' করে নেবার। ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি ঐখানে নির্ভুল মূল্যমান গড়ে তোলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

ধরা যাক সম্রাট শাজাহানের কথা! অনেক যুদ্ধ তিনি পিতার জীবিতকাল থেকেই জয় করেছিলেন ; আর তাঁর রাজ্যলাভ উপলক্ষ করে বহু স্বজননাশ ঘটে! অন্যপক্ষে ময়ূর সিংহাসনের শিল্পরুচি, জামা-মস্‌জিদ-লালকেল্লার স্থাপত্যকীর্তি তাঁরই উদ্দীপনার ফল ; পত্নী মমতাজের সমাধির ওপরে তাজমহল নির্মাণ করেছিলেনও তিনিই। এই সুনিশ্চিত

---

১ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেও রামমোহনের আবির্ভাবকাল নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ১৭৭৪-ই সম্ভাব্যতর বলে মনে হয়।

২ রবীন্দ্রনাথ—'কৃষ্ণচরিত্র' [প্রবন্ধ]: আধুনিক সাহিত্য: রবীন্দ্র রচনাবলী (বি. ভা.) ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪।

তথ্যপঞ্জীর ভেতর হতে মানুষ শাজাহানের কোন্ সত্য পরিচয়ে পৌঁছানো যেতে পারে,—কি করে? বাংলা ভাষার দু'টি উৎকৃষ্ট কবিতায়[৩] এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত মূল্যায়ন বিধৃত হয়ে আছে; তার কোন্‌টি যথার্থ, কে বলবে?

রামমোহনের বেলা ঐতিহাসিক বিচারের সঠিক নিরিখ খুঁজে পাওয়া আরো কঠিন। শাজাহান রাজনৈতিক ইতিহাসের নায়ক ছিলেন; তাঁর প্রভাবে রাষ্ট্রিক উত্থান-পতনের যে প্রকরণ উন্মোচিত হয়েছিল, আর তার যা-কিছু ফলাফল, তথ্যের নিকষেই তার মোটা দামটুকু কষে নেওয়া চলে। সেই সঙ্গে ব্যক্তি শাজাহানের চারিত্র-পরিচয় সঠিক নির্ণয় করতে পারলে অতিরিক্ত কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে। অন্যপক্ষে রামমোহন ইতিহাসকে স্পর্শ করেছিলেন তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে; তার পুরো হিসেব কেবল তথ্যের নিরিখে ধরবার উপায় নেই কিছুতেই। চোখে-দেখা ঘটনার চেয়ে সেই ঘটনার মূলগত অন্তঃপ্রেরণা ও তার অন্তিম পরিণাম ফলের নিরিখেই সে মূল্যের যাচাই করতে হয়।

একটা ঘটনার কথাই ধরা যাক্! বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সতীদাহ-প্রথা নিবারণের মুখ্য সাধকরূপে রামমোহনের নাম আবহমান কাল ধরে কীর্তিত হয়ে আসছে। অথচ ইদানীন্তন কালে আমরা জানি, লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে এই অমানুষিক প্রথা রদ করার প্রস্তাব যখন বিবেচনা করছিলেন, তখন রামমোহন তার বিপক্ষেই পরামর্শ দেন। বেন্টিঙ্ক সে পরামর্শ শোনেন নি। অন্যপক্ষে সতীদাহ-প্রথা আইন-বারিত হয়ে গেলে, বেন্টিঙ্ককে যাঁরা ভারতীয় নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, তাঁদের পুরোভূমিতে ছিলেন আবার রামমোহন রায়ই।

এইটুকু তথ্য নিয়ে সতীদাহ-প্রথার প্রসঙ্গে রামমোহনের নির্ভুল

---

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথ—'শাজাহান' ['একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান'] 'বলাকা': রবীন্দ্র রচনাবলী (বি. ভা.) ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪—২০। প্রমথ চৌধুরী—'তাজমহল', সনেটপঞ্চাশৎ পৃ. ৮।

ঐতিহাসিক ভূমিকাটি নিরূপণ করব কোন্ পথে?—রামমোহন কি এ-বিষয়ে দ্বিধাবিচলিত ছিলেন; কিংবা এ-বিষয়ে তাঁর অন্তরের ঐকান্তিকতা কি যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না? এ কালের বরেণ্য ঐতিহাসিকেরাও কেউ কেউ এমন ইঙ্গিত করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু তা-হলে ঐ একমাত্র উদ্দেশ্যে একটি মানুষের দীর্ঘদিনব্যাপী একাগ্র উদ্যম ও অক্লান্ত চেষ্টার হিসাব কি নিরর্থক হয়ে যাবে? কেবল 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' লিখেই তো তিনি চুপ করে থাকেন নি—থাকতে পারেন নি; প্রায় আঠারো বছর ব্যাপী বিপদ সংকুল অবিরাম চেষ্টার কাহিনী তো উপেক্ষণীয় নয়![৪]

বিপরীত পক্ষে একই প্রসঙ্গে রামমোহনকে সমর্থন করা হয়েছে কূটনৈতিক যুক্তির সহযোগে; এবং ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাপঞ্জী তা সমর্থনও করে। বলা হয়েছে[৫], বিদেশী শাসকরা আইন করে প্রচলিত ধর্মাচরণের প্রতিকূলতা করলে সংস্কারান্ধ জাতি একদিন বিদ্রোহে প্ররোচিত হতেও পারে, রামমোহন এমন কথা ভেবেছিলেন। আর ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিক্ষোভের কালে এই ঘটনাকেও একটি ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়! অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা কূটনীতি-সচেতনতা রামমোহন-ব্যক্তিত্বের উল্লেখ্য দু'টি উপাদান হলেও ঐতেই তাঁর মৌল চারিত্র শক্তি নিহিত নেই। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলেছিলেন 'ভারত পথিক'; অনেকের চোখে সেটা অত্যুক্তি! তাহলেও দীর্ঘকালের ভাবনা-সূত্রে তাঁর ভূমিকা নির্দেশিত হয়েছে বাংলার নবজাগরণের—'রেনেঁসাস্'-এর—ইতিহাসে। এ নিয়ে মত-পার্থক্য রয়েছে; অর্থাৎ বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের দানের পরিমাপ নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে; কিন্তু এমনকি নিছক

৪ দ্র. Sophia Dobson Collet.—'The Life and Letters of Raja Rammohan Roy' [Ed. Dilip Kumar Biswas & Prabhat Chandra Ganguly] পৃ. ১০৬।

৫ দ্র. তদেব। পৃ. ২৫৭।

সময়ের হিসাবও তিনি যে ঐ নবজাগরণ-যুগেরই অংশীদার, তাতে সন্দেহ নেই।

আর নবজাগরণ কোনো তথ্য-পরিবদ্ধ ঘটনা মাত্র নয়—আসলে তা এক সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধে উজ্জীবন। ইতিহাসে নবজাগরণের সঙ্গে আধুনিকতাকে সাধারণত গ্রন্থিবদ্ধ করে দেখা হয়; আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন[৬], আধুনিকতা একটি 'মর্জি'। বস্তুত সুনির্দিষ্ট এক মূল্য-চেতনা নিয়েই রেনেসাঁসের ইতিহাস; আর তার উপযোগী মর্জির উজ্জীবনে রামমোহনের সফলতা-বিফলতার নিরিখেই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর যা-কিছু মূল্য এবং স্মরণীয়তা।

অন্যপক্ষে এ-কথাও সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, যুক্তি-নির্ভর মানবিকতাবোধে উত্তরণই রেনেসাঁসের প্রধান আগ্রহ। রামমোহনের মূল্যায়ন সূত্রে সেই আগ্রহের উৎসটুকুকেই খুঁজে পেতে হবে। নিছক বহিরঙ্গ তথ্যের কাঠামোকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় মেতে তাঁর সম্পর্কে ইতিহাসের সত্যে উপনীত হওয়া যাবে না।

এই সূত্রেই বুঝতে হবে, সতীদাহ-প্রথা নিবারণ রেনেসাঁসের মূল্য-চেতনার পক্ষে একটি স্বয়ম্পূর্ণ অভীষ্ট হতে পারে না,—কিংবা এমন কি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাও নয়। এগুলো যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতাবোধ—'র‍্যাশন্যাল হিউম্যানিজম্' নামক অভীষ্টে পৌঁছে যাবার উপায় মাত্র। বস্তুত মানবিকতাবোধের প্রথম শর্ত হল মানুষ মাত্রেরই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি; বিশেষভাবে দুর্বল মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গেই মানবিকতাবোধের অগ্নিপরীক্ষা। রাজার জাতের পক্ষে জোর করে প্রজার জাতের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে চাপ সৃষ্টি করার অমানবিকতার প্রতি রামমোহন কঠোর তর্জনী নির্দেশ করেছিলেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রধানত খ্রীষ্টীয় ধর্ম যাজকদের জবরদস্তির প্রসঙ্গে। তার বহু বছর পরে তাঁর অভিপ্রেত সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কেও আইন-

৬ দ্র. রবীন্দ্রনাথ: 'আধুনিক কাব্য' [প্রবন্ধ]: 'সাহিত্যের পথে' রবীন্দ্র রচনাবলী (বি. ভা.) ২৩ খণ্ড, পৃ. ৪২০।

প্রয়োগে তাঁর আপত্তি ছিল ঐ নীতিগত কারণেই ; এই সিদ্ধান্তটুকুর তাৎপর্য অধিগত করতে পারলেই রামমোহনকে বাঙালির নবজাগরণিক মূল্যবোধের বলয়ের মধ্যে যথাযথ অবধারণ করা সম্ভব হয়। পরবর্তী আলোচনায় এ-প্রসঙ্গ বিস্তারিত হয়েছে।[৭]

অন্যপক্ষে এমন ধিক্কারও অধুনা উচ্চারিত হয়েছে যে, একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রবর্তন, তথা সর্বপ্রকার সাকার পূজার ঐকান্তিক বিরোধিতার পরেও কলকাতা-জোড়া বার-ইয়ারি দুর্গা কিংবা সরস্বতী পূজার অক্লান্ত ঢক্কা নিনাদই নাকি রামমোহনের ঐতিহাসিক ব্যর্থতার সাক্ষ্য ঘোষণা করছে। এখানেও কিন্তু ঘটনার চেয়ে প্রেরণার তাৎপর্যের মধ্যেই ইতিহাসের সত্যকে খুঁজে পেতে হবে।

রামমোহন যে মূল্যবোধটুকুকে সেদিন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, আসলে তা বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মের যুক্তি-সমর্থিত এক নবরূপ। বেদান্তের নাম পর্যন্ত সেকালের বাংলাদেশে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ; উপনিষদকে বলা হয়েছিল রামমোহনের জালিয়াতির ফসল ; অথচ পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীরও বেশি কাল ধরে ব্রাহ্ম-হিন্দু নির্বিশেষে সর্ব ধর্মের মৌল ভিত্তিরূপে বেদান্ত-প্রতিপাদ্যতার নিরিখই পুনঃপুন প্রযুক্ত হয়েছে। একালের কলকাতার 'বারইয়ারি' উল্লাস কেবল রামমোহন নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দেরও গরিমা-বর্ধক নয়, সে এক পৃথক প্রসঙ্গ ; নবজাগরণের ফসল কেন ব্যাপক অথবা সুস্থির হতে পারে নি আমাদের জীবন-ধারায়, সে হিসাব স্বতন্ত্র। তার দ্বারা নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন-বিবেকানন্দের স্ব স্ব ভূমিকা মহিমা-চ্যুত হয়ে পড়ে না।

হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গেও একই কথা। রামমোহন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হন নি ; বরং মর্যাদা ও বিত্তসম্পন্ন হিন্দু নাগরিকদের কেউ কেউ রামমোহনকে বর্জন না করলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না, এরকম সম্ভাবনা দেখা দিলে রামমোহন নিঃশব্দে প্রথম উদ্যোক্তাদের সারি থেকে স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছিলেন। এ-সব

৭ দ্র. বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৭-২০।

সত্ত্বেও হিন্দু কলেজ নামক বিদ্যায়তনটি বাঙালি নবজাগরণের ইতিহাসে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল যে অন্তঃ-প্রেরণার বৈশিষ্ট্যে, তার উজ্জীবন ও প্রসার সাধনে রামমোহনের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকাটির পরিমাপ করেই রেনেসাঁসের ইতিহাসে তাঁর মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

আসলে স্থূল ঘটনাবলির তালিকা নির্মাণের চেয়ে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত —পার্স্পেক্টিভ্-এ তুলে ধরে সেই সব ঘটনার অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও তাৎপর্যের গভীরেই ইতিহাসের সত্য সন্ধান করে দেখতে হয়। রামমোহন সম্পর্কিত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ঐ পরিপ্রেক্ষিতটি আজও সঠিক নির্ণীত হয় নি; তাই তাঁকে নিয়ে প্রাথমিক বিতর্কের অবসান আজও হল না।

একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্তেই আসা যাক্। গান্ধীজি এক সময়ে রামমোহনের সম্পর্কে 'পিগ্‌মি' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন; এসব খবর জনশ্রুতি থেকে গুজবের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছে। অথচ এ-নিয়ে ইদানীন্তন কালের অনেক উত্তাপই প্রশমিত হতে পারবে গোটা আলোচনাটিকে সঠিক পার্স্পেক্টিভ্-এ গ্রহণ করা সম্ভব হলে।

গান্ধীজির নালিশ আসলে ছিল ঔপনিবেশিক বিদ্যা ও ইংরেজ সংসর্গের বিরুদ্ধে। তাঁর মনে হয়েছিল, জাতীয় জাগরণে ঐসব বিজাতীয় প্রভাব সীমাবদ্ধ হয়েই পড়ে; বিপরীত কোটিতে ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে সেই জাগরণ ও মুক্তি অবাধ-প্রসারিত হতে পারে। ঐ ব্যক্তিগত বিশ্বাস সূত্রেই তাঁর বক্তব্য ছিল[৮]—(১) রামমোহন এবং

৮ 'Rammohan and Tilak were so-many pygmies who had no hold upon the people compared with Chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak. Rammohan and Tilak were pygmies before these giants. What Sankar was able to do a whole army of English-knowing men can't do.'

এবং

'Tilak and Rammohan would have been far greater men if they had not had the contagion of English learning ….It is my conviction that if Rammohan and Tilak had not received this

তিলক জনতার ওপরে তাঁদের অকিঞ্চিৎকর প্রভাবের প্রতি-তুলনায় চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর ও নানকের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ—'পিগ্‌মি'; আর (২) তিলক ও রামমোহন আরো অনেক বড় মানুষ হতে পারতেন যদি ইংরেজি শিক্ষার সংক্রমণ দোষ তাঁদের মধ্যে না ঘটত; সেক্ষেত্রে চৈতন্যের মত তাঁরাও আরো অনেক বড় কাজ করতে পারতেন।

যথোচিত পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বুঝ্‌ব, গান্ধীজির মন্তব্যও নিছক নিন্দা নয়, 'নিন্দাচ্ছলে' যদি না-ও হয়, তবু নিন্দামিশ্রিত স্তুতি। অর্থাৎ জনজাগরণের সংসাধক রূপে রামমোহন ও তিলক যে আধুনিক ভারতের দুই তুঙ্গাসীন ব্যক্তিত্ব, গান্ধীজিও সে-বিষয়ে সংশয়হীন। কেবল তাঁর আক্ষেপ, প্রাচীন ভারতের নমস্য প্রবোধকদের মত জন-জীবনে এঁদের প্রভাব অত ব্যাপ্ত হতে পারল না! অতএব ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের অগ্রপথিকের ভূমিকা সম্পর্কে গান্ধীজিও একমত। কেবল তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রামমোহন বা তিলক-এ ইংরেজি শিক্ষার সংসর্গদোষ না ঘটলে ভারতীয় জনপ্রবোধনে এঁদের ভূমিকাও পূর্বাচার্যদের মত সর্বব্যাপী হতে পারত।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে ইতিহাসের বিতর্ক চলতে পারে না,—তা সে ব্যক্তিত্ব যতই মহনীয় হোক্। তবে গান্ধীজির সিদ্ধান্তের পেছনে তাত্ত্বিক সমর্থনও রয়েছে কিছুদূর পর্যন্ত। রামমোহনের নবজাগরণ-মূল্য-প্রণোদিত চেতনা ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বুদ্ধিজীবী সমাজের সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় জনজীবনে প্রসারিত হতে পারে নি, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। বস্তুত তিনি যা-কিছু করেছেন, ভেবেছেন, বলেছেন এবং লিখেছেন,—সবই যে ঐ সীমাবদ্ধ জনগোষ্ঠীর মুখ চেয়ে, তাতেও সন্দেহ নেই। বস্তুত পৃথিবী-জোড়া রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশ ঐ সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই। আর ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে রামমোহন-কেন্দ্রিক

---

education but their natural training, they would have done greater things like Chaitanya.'.

—M. K. Gandhi: 'Young India' April 18, 1921. তথাচ সোমেন্দ্রনাথ বসু: 'রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা' [উদ্ধৃতি] পৃ. ২৯।

নবজাগরণের গ্রহণোপযোগী বাতাবরণ অন্তত গড়ে উঠেছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে।—একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তাহলেও নবজাগরণের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগীয় উজ্জীবন সম্ভব অথবা আদৌ কাম্য কি না, সে প্রশ্নও একান্ত প্রাসঙ্গিক। কিংবা নিছক প্রসার-পরিধির হ্রস্বতার দরুনই রামমোহন-তিলকের দান এমন কি আপেক্ষিকভাবেও তুচ্ছ হয়ে পড়ে কি না, সে বিতর্কও অবান্তর নয়। সংস্কৃতি সর্বস্তরেই মন ও বুদ্ধির পরিশীলন সাপেক্ষ; স্বভাবতই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকর্ষের পার্থক্য সেখানে অনিবার্য, এবং তার ফলে চরম ফল স্বল্পজনেরই আয়ত্তগম্য হয়ে থাকে। তাই বলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আয়ত্তের অতীত মনে করেই উৎকর্ষের চরম মানকে পরিহার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; বরং ইতিহাসের একটা পর্যায়ে সমাজের সমুচ্চ স্তর থেকেই চিৎ প্রকর্ষের ফসল নিম্নমুখে ক্রমপ্রসারিত হতে থাকে; তার ফলে উচ্চাবচ সকল পর্যায়েই সমাজ আপেক্ষিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে চলে।

স্রোতের উল্টোমুখে নদীকে চালনা করা সুসাধ্য নয়, স্বাভাবিকও নয়। ইতিহাসের পক্ষেওসেই একই কথা! আধুনিক যুগের জাগরণের প্রকৃতি ও পরিধি মধ্যযুগের অনুরূপ কেন হল না, এমন আক্ষেপ নিরর্থক; অনেকটা গ্রীষ্মকালে আম গাছে কেন শীতের কমলা ফলে না,—তারই মত। রামমোহন বা তিলকের ঐতিহাসিক ভূমিকাও যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে ধরেই যাচাই করা চাই; মধ্যযুগীয় সাধু সন্তদের সঙ্গে তাঁদের প্রতি তুলনার চেষ্টা ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের অনুকূল হয়ও যদি, তবু সর্বথা যুক্তি-সিদ্ধ নয়। বরং নবজাগরণিক প্রেক্ষিতে রামমোহনের দান সম্পর্কে সঠিক মূল্য নির্ণয় করে তবেই ইতিহাসে তার প্রভাবের ব্যাপ্তি বা স্থায়িত্বের কথা ভাবা যেতে পারে। অন্তত সেইটেই সঙ্গত প্রচেষ্টা।

এই সব কথা মনে এসেছিল নানা আকারে, যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালের রামমোহন স্মারক বক্তৃতা দেবার সানুগ্রহ আহ্বান এল। বস্তুত এই পুস্তিকার পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধ

ঐ বক্তৃতার আকারেই নিবেদিত হয়েছিল। আসল আকাঙ্ক্ষা ছিল যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতটির রূপরেখায় পরিক্রমা করে ফেরার। তাও অনিবার্য একাধিক কারণে সীমিত হয়েই পড়েছে।

ইতিহাসের সকল স্তরেই নবজাগরণ আসলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনে এক সর্বায়ত উজ্জীবনের পরিবাহক। শিক্ষা, সাহিত্য, সংগীত-কলার ক্ষেত্রেই নয় কেবল, অর্থ-রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ-বন্ধন—জীবন-যাত্রার সকল স্তরে নবীন মূল্যবোধের উদ্দীপনা সংক্রমণেই তার যা-কিছু সাফল্য কিংবা সজীবতা। আর রামমোহন্ বাংলাদেশের রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্ব মূর্তিমান্; কারণ নিজের দেশ-কালের সামগ্রিক উজ্জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার ও আত্মদান প্রায় তুলনা-রহিত।

তাহলেও বর্তমান আলোচনায় একটিমাত্র উপকরণকেই কেবল অবলম্বন করা হয়েছে—বাংলা সাহিত্য। তার প্রধান কারণ হু'টি; (১) আলোচক বাংলা সাহিত্যের ছাত্র; তাঁর বিদ্যার পরিচিত পরিধি একটা নির্দিষ্ট সীমার অতিক্রমণে দ্বিধাগ্রস্ত, আর (২) আলোচ্য প্রসঙ্গেই রামমোহনের নবজাগরণিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতটি সহজ-বোধ্য হতে পারে।

এদিক থেকে অনুরাগী অনুকূল জনেরাও সত্য সন্ধানের পথে কম অন্তরায় সৃষ্টি করেন নি। রামমোহনকে নবজাগরণের পথিকৃতের আসন দেবার অতি-আগ্রহের ফলে অনেক সময়ে তাঁকে নানা ঘটনার পুরো ভূমিতে সশরীরে উপস্থাপিত করার অমূলক চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। বাংলা গদ্য ভাষার সাহিত্যিক রূপের উন্মোচন ও ক্রমবিকাশ বাঙালি রেনেসাঁসের এক মুখ্য লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অতএব এখানেও রামমোহনকে পুরোধার আসনে প্রতিস্থাপিত করার উৎসাহ একদা ঐকান্তিক হয়েছিল। সেই সূত্রে এমন দায়িত্বহীন তথ্যের উত্থাপন করা হয় যে, রামরাম বসু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করে রামমোহনকে তা সংশোধন করতে দিয়েছিলেন। অথচ

বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তখন রামমোহনের প্রথম পদক্ষেপও ঘটে নি; স্থায়িভাবে তিনি কলকাতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন ১৮১৩-র আগে নয়। তাছাড়া এমন কি 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-র যা ভাষা-চরিত্র তাতে ঐ গ্রন্থের সংশোধন করার দায়িত্ব স্বীকার রামমোহনের পক্ষ থেকে শ্লাঘণীয় হবার কারণ নেই; বরং বিপরীতটিই হওয়া উচিত।

এখানেও শেষ নয়, কোনো অনুরাগী বিদগ্ধ জন আরো পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের সূচনালগ্নকে 'রামমোহন-যুগ' বলে অভিহিত করে ঐ 'যুগে' রামমোহন-অনুসরণের সূত্র নির্দেশে ব্যস্ত হয়েছিলেন। অথচ নিছক তথ্যের বিচারেও রামমোহন প্রথম গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার আগেই (১৮১৫) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সকল উল্লেখ্য পুস্তকের রচনা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল ১৮১৩-র মধ্যে। আর রামমোহনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে তিনি প্রথমাবধি ছিলেন নিঃসঙ্গ পথিক। বস্তুত ঐখানেই তাঁর পথিকৃৎ চরিত্রের অনপনেয় প্রমাণ। রামমোহনের প্রগতিশীল নানামুখী প্রয়াস সেকালের হিন্দুকলেজ-সংবর্ধিত তারুণ্যের হাতে বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছিল; তাহলেও তাঁর স্বতউৎসারিত আন্তরিক মূল্য-চেতনা সেদিন যথাযথ সামগ্রিক তাৎপর্যে অনুভূত হতে পারে নি।

বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেই আসা যাক্। ভাষা অথবা সাহিত্যের চর্চা রামমোহনের গদ্য-লেখার দূরতম আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। ধর্মীয় এবং সামাজিক নবজাগরণের এক বিশেষ উদ্দীপনাকে লোকসাধারণের মজ্জাগত করে দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি আপন মাতৃভাষায় লেখনী চালনা করেছিলেন। অথচ সেই সূত্রে একেবারে প্রথম গ্রন্থের মুখবন্ধে ভাষা-পাঠ সম্পর্কিত সঠিক নির্দেশ দিয়ে 'অনুষ্ঠান' প্রকরণ লিখলেন তিনিই। নিছক ভাষা শেখাবার জন্যে যাঁরা কেবল পাঠ্য পুস্তক রচনাতেই বৃত হয়েছিলেন, তাঁরাও—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অথবা রামরাম বসু—কেউই এমন যুক্তিসম্মত প্রকরণ অনুসরণ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার প্রথম নীতি-নিষ্ঠ সার্থক ব্যাকরণও লিখে গিয়েছিলেন তিনিই।

রামমোহন বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক নন, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের তিনি পথিকৃৎ। এই মূল্যমানকে অনুধাবন করতে পারলেই বোঝা যাবে, নিছক অঙ্কের কিংবা তথ্যের নিরিখে প্রথমতম না হয়েও রামমোহন কি করে বাঙালির রেনেসাঁসের অ-দ্বিতীয় প্রাণপুরুষ হতে পেরেছিলেন। বাংলা সংবাদ পত্রেরও তিনি প্রবর্তক নন; কিন্তু স্বাধীন নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার যা অবিনশ্বর আদর্শ, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসকে তিনিই তা প্রথম সমর্পণ করে গেছেন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ-গোষ্ঠিতে অনুপস্থিত থেকেও নব্যবঙ্গের প্রাণস্পন্দনকেও তিনিই সঞ্জীবিত করে তোলার প্রথম দায়িত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন। এ সবই আসলে একই প্রক্রমের নব নব অভিব্যক্তি। সেই পরিপ্রেক্ষিতটিকেই কেবল সীমায়িত গণ্ডিতে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি; এ কেবল সঠিক মূল্যমানটির অনুসন্ধান-চেষ্টা! তারপরেও রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকার নির্ভুল সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা মৌলিক উদ্ভাবনী সৃষ্টির অপেক্ষা করে থাকবেই।

ঋণ-স্বীকার

পুস্তিকাটি আকারে ছোট হলেও উদ্যম দাবি করেছিল অশেষ ; সেই সূত্রে কৃতজ্ঞতার বোঝা ভারি হয়েছে বিদগ্ধ জনের বিচিত্র দাক্ষিণ্যে।

মৌলিক ঋণ আমার সারস্বত জননী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সানুগ্রহ আহ্বান না পেলে এ-লেখার পরিকল্পনাই মনে আসত না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিন ব্যাপী বক্তৃতার সময়ে অধ্যাপক ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক ড. ক্ষুদিরাম দাস যথাক্রমে বক্তৃতা-সভার কর্ণধারণ করে আমায় অনুগৃহীত করেছিলেন ; তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন নিবেদন করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যস্ত তহবিলসমূহের আধিকারিক শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর পাল তাঁর সুদক্ষ পরিচালনাগুণে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন ; প্রতিদিনের পরিপূর্ণ সভাকক্ষে সমবেত বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ ;—সকলকে আমার বিনীত নমস্কার।

পুস্তিকাটি প্রস্তুতির কালে যাঁদের আনুকূল্য উপকৃত করেছে, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই সমুল্লেখ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ড. আহমদ শরীফ ও অধ্যাপক জনাব মনসুর মুসা ; তাছাড়া আছেন সহকর্মিবন্ধু অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ড. নির্মলকুমার দাশ, স্নেহভাজন শ্রীমান গৌরচন্দ্র সাহা ও স্নেহাস্পদা শ্রীমতী পার্বতী গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের সকলকে যথাযোগ্যভাবে শ্রদ্ধা,প্রীতি ও শুভকামনা নিবেদন করি।

আর সবিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি সাহিত্যশ্রী-র উদ্যমী তরুণ প্রকাশক শ্রীমান তপনকুমার ঘোষকে। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশে তাঁর উৎসাহ এবং নিষ্ঠা অল্পদিনেই বহুল স্বীকৃতি লাভ করেছে ; তাঁর প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

বাংলা বিভাগ : বিশ্বভারতী — শ্রীভূদেব চৌধুরী

১

বাঙালির নবজাগরণ ও রামমোহন

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন[১] "রামমোহন রায় ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের গোড়াপত্তন করেন।" আর আমাদের আধুনিকতার জন্ম 'রেনেসাঁস'-এর সূত্রেই, যার বঙ্গীকরণ হয়েছে 'নবজাগরণ'। ভারত তথা বাঙালির নবজাগরণে রামমোহনের ভূমিকার তারতম্য বিষয়ে বিতর্ক যতই হোক্, অন্যতম মুখ্যতা নিয়ে সংশয় নেই। তাহলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্বয়ংসেবিত গুরুতা সম্পর্কে আপত্তি দেখা দিতেই পারে।

বস্তুত ধর্মীয় প্রত্যয় ও বিচার-চিন্তাকে আশ্রয় করেই রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মৌল বিকাশ; ক্রমশ সেই অসাধারণ মনীষার দীপ্তি শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি-অর্থনীতির ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে থাকে। তাহলেও বাংলা সাহিত্যের সংগঠন বা জাগরণে কোনো সচেতন উদ্যোগ বা উৎসাহ তাঁর নিশ্চয়ই ছিল না। আসলে আরবি-ফারসি-ইংরেজি এবং সংস্কৃত-র মত বাংলা ভাষাকেও কেবল আপন বক্তব্য প্রকাশের অন্যতম বাহনরূপেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন; তদধিক কিছু নয়। এ-সব তথ্যই মোটামুটি স্বীকার্য, তবু প্রস্তাবিত আলোচনার বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে, 'বাংলা

---

১ "Rammohun Ray Inaugurated the Modern Age in India"—Rabindranath Tagore: 'The Father of Modern India'—Commemoration Volume of the Rammohun Ray Centenary Celebration Committee 1933, Part II, P. 1.

সাহিত্যের নবজাগরণ ও রামমোহন', এ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ এক কথায় নিবেদন করা কঠিন।

একটা কথা মানতেই হয়; ইতিহাস কেবল তথ্যমাত্র-উপজীবী নয়। কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট ঘটনার সংস্পর্শ বা সংঘর্ষে কোনো বিশেষ দেশ-কালগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিকশিত বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই ইতিহাসের রূপ-রেখা গড়ে ওঠে। চতুর্দশ শতকের ইতালিতে ভেনিস্-এর সম্পদ-সংগতিই সব চেয়ে বেশি ছিল, তবু 'রেনেসাঁস'-এর উন্মেষ ঘটল ফ্লোরেন্স-এই। অথবা উনিশ শতকে প্রায় সম-সময়ে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু আগেও, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার প্রসার ঘটে থাকলেও বাংলাদেশেই কেন ভারতীয় 'রেনেসাঁস'-এর সূতিকাগার! এ-সব জিজ্ঞাসার সকল উত্তরই পাথুরে তথ্যে উৎকীর্ণ নেই।

উইল ডুরাণ্ট বলেছিলেন,[২] কেবল ক্লাসিক্যাল পাণ্ডুলিপির প্রভাবেই ইতালির রেনেসাঁসের মানস মুক্তি সম্ভব হয় নি, মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিকাশজনিত ধর্মনিরপেক্ষতায় তা সাধিত হয়েছিল। এই সূত্রেই প্রাসঙ্গিক অপরাপর উপকরণের প্রতিও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। অবশ্য ইতালি এবং ভারতবর্ষের রেনেসাঁস নানা দিক থেকেই বিভিন্ন-চরিত্র; এবং তার কারণও রয়েছে। সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু আজ আমরা যাকে 'রেনেসাঁস' বলি, পৃথিবী জুড়ে তার অধিকাংশ সুফলই যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের পরিণাম, সে-বিষয়ে দ্বিমত নেই। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির মত রেনেসাঁসের সাহিত্য-চরিত্রও সেই সমুচ্চ মানস পরিণতির সোনার ফসল। বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণও সেই চারিত্র-চিহ্নিত। আর ইতিহাসের আশ্চর্য রহস্য-বশে ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসিকতার সর্বায়ত নিটোল প্রকৃতিটি রামমোহন-ব্যক্তিত্বে প্রথম এবং সম্পূর্ণরূপে

২ Cf. Will Durant—'The Renaissance' [The Story of Civilization; Part V]—P. 768.

বিস্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বৃহত্তর জীবনে সেই নবজাগরণের লক্ষণ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে প্রধানত ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেরও বেশি সময় ধরে; আর বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার মুক্তি-কাল ১৮৬১ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ; 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে 'গীতিমাল্য'-'গীতালি' প্রকাশের দিন পর্যন্ত। কিন্তু এই শতাব্দীব্যাপী প্রবহমান ধারায় নানা গ্রন্থি, জটিলতা, বিরোধ-বিভ্রমের মধ্য দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত মনোধর্মের নবজাগরণের যে ব্যাপক-বিচিত্র ছবিটির আভাস আজ মনে জাগে, তার পুরোপুরি একটি আদর্শ রামমোহনের জীবনে ও আচরণে সংহত রূপ ধরেছিল একত্র; এই অর্থে তিনি বাঙালি রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্ব মূর্তিমান; এমনটি আর কোথাও দেখা গেছে বলে জানা নেই; বর্তমান প্রসঙ্গে সেই রহস্যের উন্মোচনই প্রাথমিক প্রয়োজন।

শুরুতেই তর্ক দেখা দেয় বাঙালির 'রেনেসাঁস'-এর চরিত্র, কিংবা এমন কি, তার অস্তিত্ব নিয়েও। ফরাসি ভাষায় 'রেনেসাঁস' শব্দ তার ইতালীয় উৎস-সূত্রেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বহন করে এসেছিল 'পুনর্জন্ম', তার থেকে 'নবজন্ম',—আমরা বলি 'নবজাগরণ'; মৌল ভাব-তাৎপর্যে মানবিক সচেতনতার মধ্যে পুনর্জন্ম, মানবিকতাবোধে নবজাগরণ। মানুষের মধ্যেই দ্বৈত সত্তা রয়েছে। তার জৈবতা অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় পরাহত,—জড়তাচ্ছন্ন। মানবিকতা বলি মানুষের সেই আভ্যন্তর সুপ্ত সম্ভাবনাকে, বিবর্তনমূলক পরাধীন জীবনধারার ওপরে যে আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনে নিরন্তর সচেষ্ট। প্রচলিত সংস্কার আছে, দিব্যভাবনা থেকে উত্তরণই 'রেনেসাঁস'-এর পথে প্রথম পদক্ষেপ। য়ুরোপের মধ্যযুগে তাই অনিবার্য হয়েছিল: চার্চ-এর শাসন তখন ধর্মের নামে মানুষের আত্মকর্তৃত্ব-চেতনাকে—আত্মবিশ্বাসকে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল। রাম-মোহনের যুগে তার বিপরীতটি ঘটতে দেখি;—ধর্মীয় ভাবনার মুক্তিবিধান করে মানবিক মুক্তির পথ প্রসারিত করাতেই ছিল তাঁর

আন্তরিক উত্তম। তাতে কিছু যায় আসে না। আসলে মানবিকতা বোধের মূল ভাবনা হল,[৩] "মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি।"—ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ শিক্ষা সব কিছুই মানুষের প্রয়োজনে তারই কর্তৃত্বসূত্রে নিয়ন্ত্রিত, কোনো জড় বা অলৌকিক রহস্য-শক্তির কাছে তার দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের অবাধ মুক্তির অধিকার গচ্ছিত থাকবে না। রামমোহন অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষের মৌল ধর্মচেতনায় মানুষের আত্ম-মুক্তির পথ সহজে বিস্তারিত হয়েছিল; কেবল মধ্যযুগীয় অন্ধ সংস্কার তার স্বধর্মকে করেছিল আবিষ্ট, সেই সংস্কারান্ধতার পরিমার্জনা করেই তিনি মানুষকে স্ব-চেতনা এবং স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। য়ুরোপে 'চার্চ'-এর অন্ধ প্রমত্ততা ছিল রেনেসাঁস-পূর্ব যুগের মানবিক বন্ধন; আমাদের দেশে ছিল মধ্যযুগীয় সামাজিক কুসংস্কার। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে,[৪] "প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে 'রিলিজন' নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন, পলিটিক্স সমস্তই আছে।" রামমোহনের জীবন-সাধনা ধর্মকে 'রিলিজন'-এর সীমিত গণ্ডিবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে সর্বাত্মক মানবিক বিকাশের ভিত্তিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তারই ফলে নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা 'সামাজিক কর্তব্যতন্ত্রে'র সকল ধারা-উপধারাকেই এমন ব্যাপক ও গভীরভাবে স্পর্শ করতে পেরেছিল, সাহিত্যও তার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে বহুলাংশে হয়ত বা সাধকের অজ্ঞাতেও। সে-কথায় ধীরে ধীরে আসব; তার আগে কেবল মনে রাখতে হয়, য়ুরোপীয় রেনেসাঁস লক্ষণের খুঁটিনাটিতে পাথুরে তথ্যগত বৈসাদৃশ্যের দরুন রামমোহনের রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অবধারণে বিভ্রান্তি যেন না ঘটে।

৩ অন্নদাশঙ্কর রায় 'বাংলার রেনেসাঁস'—পৃ. ৩।

৪ রবীন্দ্রনাথ—'সমাজভেদ' [স্বদেশ]—রবীন্দ্র রচনাবলী ১১—পৃ. ৪৮৫।

বিভ্রান্তি অবশ্য অপর দিক থেকেও দেখা দিয়ে থাকে। এমন কথাও বলা হয়, বাঙালির 'ন্যাসান্স' হল কবে, যে 'রিন্যাসান্স'-এর কথা ভাবা যায় ;—জাগরণ কখনও ঘটে থাকলে তবেই তো নবজাগরণের প্রশ্ন ! ইতালীয়রা মনে করতেন ক্লাসিক্যাল যুগের মানবিক জাগরণ খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার অভিঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল ; তারই পুনর্জন্ম ঘটে রেনেসাঁসের কালে। বাংলাদেশের বহু সহস্রাব্দব্যাপী ইতিহাসের কথা স্পষ্ট জানা নেই, কিংবা তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিকও নয়। কিন্তু উনিশ শতকের আগে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে মানবিকতাবোধের এক চূড়ান্ত উদ্বোধন ঘটেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে, এবং তাও অপর এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে ঘিরে ; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তিনি।

চৈতন্যপূর্ব নবদ্বীপের বহু পরিচিত বর্ণনা রয়েছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'[৫]। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ধর্মের মানবিক সম্পদ ও বলিষ্ঠতা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। ধর্মের নামে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গেয়ে রাত্রিজাগরণ কিংবা 'বহু ধন' দিয়ে 'দম্ভ' ভরে বিষহরি বা 'পুত্তলি' পূজাই তখন প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল ; এমন পরিবেশে মানবিক প্রেমের পরম পরিস্ফুতিই একমাত্র সাধ্য বলে ঘোষণা করার সাহস ও শক্তি সেদিন ইতিহাসে নবযুগ সঞ্চার করেছিল। আর যথার্থ প্রেমই তো মানবিক বলিষ্ঠতারও মুখ্য উৎস। চৈতন্যের ধর্ম ভাব-বিহ্বলতা ও নৈতিক শৈথিল্যবশে বাঙালিকে দুর্বল করেছিল, এমন বিভ্রান্তিও একালে অপ্রচুর নয়। কিন্তু এমনকি বিশুদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের সিদ্ধান্তও এর বিপরীত[৬]—"পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্য কৃষ্ণনাম করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে গৌরবের আদর্শ

৫ দ্র. বৃন্দাবন দাস—'চৈতন্যভাগবত' [আদিখণ্ড] দ্বিতীয় অধ্যায়।

৬ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার [সঃ]—'বাংলাদেশের ইতিহাস' : মধ্যযুগ পৃ. ২৭৪।

তুলিয়া ধরিলেন, মধ্যযুগে তাহার তুলনা মিলে না।"—এই প্রসঙ্গে 'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যখণ্ড থেকে কাজি-দমনের কাহিনী সবিস্তার আলোচিত হয়েছে। কিংবা মানবিক মূল্যচেতনার অভিনব ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,[৭] "চৈতন্য যে আনুষ্ঠানিক বিধি-বিধান বাদ দিয়া স্ত্রী-পুরুষ ও উচ্চনীচ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল প্রেম-ভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল।" তথা-কথিত নীচ জাতির সর্বময় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, নারীর অবরোধ প্রথামুক্তি ও সামাজিক শীর্ষাসনে অধিকার লাভের মধ্য দিয়ে প্রধানত এই বৈপ্লবিকতার বিকাশ ঘটেছিল।

কিন্তু আক্ষেপের কথা,[৮] "চৈতন্যের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।" বস্তুত 'এক শতাব্দী' কালের মধ্যেই তার বিনষ্টি সূচিত হয়। আত্মশক্তির বদলে অলৌকিক দৈবে অন্ধ নির্ভর, পৌরুষের পরিবর্তে কাপুরুষতা, নৈতিক দৃঢ়তার স্থলে ব্যাপক যথেচ্ছাচার, আর সমস্ত কিছুর সমর্থনে দুর্বল কুসংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ, এই সবকিছু মিলে সে ছিল জৈব জড়তাবিদ্ধতার এক চরম অন্ধকার যুগ। বাঙালির নবজাগরণ আসলে এই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে মানবিক আত্ম-কর্তৃত্বসচেতনতায় উত্তরণের ইতিহাস; রামমোহনের বিশেষিত প্রবণতা ও সাধনার সূত্রে আধুনিক মানব-চেতনায় তা এক আধ্যাত্মিক প্রমুক্তির পথ উৎসারিত করতে চেয়েছিল; অন্তত উনিশ শতকের বাঙালির মানবিক জাগরণ মুখ্যভাবে আধ্যাত্মিক চরিত্র-বিশিষ্ট যে, তাতে সন্দেহ নেই; এইখানেই বাঙালির নবজাগরণ-এ রামমোহনের পথিকৃৎ-এর ভূমিকা।

আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরমনস্কতা অনিবার্যভাবেই একার্থক না-ও

৭ তদেব—পৃ. ২৭৭
৮ তদেব—পৃ. ২৭৭

হতে পারে, অবশ্য হলেও কিছু বাধা নেই। বিশেষভাবে যা আত্মার সম্পর্কিত কিংবা আত্মভাবের উদ্বোধক ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাই 'আধ্যাত্মিক'। আর 'আত্মা' বলতে বুঝব মানুষের দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকারের সমবেত 'ফলশ্রুতি'—অথচ তদতিরিক্ত একটা কিছুকে। ঐ সর্বব্যাপী অথচ সর্বাতিশায়ী অন্তঃসত্তাই কর্তৃত্ব-প্রবুদ্ধ মানবিক শক্তির স্থায়ী আধার; মানবিকতার জাগরণ-সন্ধানী রামমোহন এই আত্ম-অন্বেষণের পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

কিন্তু এটুকু পরিণামী চরিত্রের কথা। ইতিহাসের ধারায় বাঙালির নবজাগরণ আসলে মধ্যযুগীয় বিপর্যয় ও বিনষ্টিরই প্রতিক্রিয়া-প্রসূত। সেই বিনষ্টির লক্ষণ স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই। চৈতন্যের তিরোভাবের (১৫৩৪ খ্রীঃ) একশ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনেও পুরাতন স্থিতিস্থাপকতার পরিবর্তন ঘটেছিল। মোগল-শাসন-ব্যবস্থায়, প্রধানত শাহজাহানের রাজত্বের সূচনা কালেই (১৬২৮ খ্রীঃ) বাংলাদেশে আবার সর্বাত্মক ভারসাম্য গড়ে ওঠে; বস্তুত ঐ সময়েই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথম অভ্যুদয়। কিন্তু চতুর্দশ শতকের ভেনিসীয় সমাজের মতোই এঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থ, লোভ, বিলাস-ব্যসন এবং দুর্নীতি ব্যভিচারেই মত্ত হয়েছিলেন। সহজে সম্ভোগের এই অন্ধ প্রবৃত্তি সমাজে ব্যাপকভাবে সহজিয়া প্রবণতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব অথবা লোকায়ত সহজিয়া সাধনার উপলক্ষে নৈতিক দুর্বলতা যেমন নিরন্তর হয়েছিল, তেমনি ধর্ম, সমাজ, শিক্ষার সকল স্তরেই সীমিত সংকীর্ণতা এবং আবিলতা এক সাধারণ লক্ষণ হয়ে দেখা দেয়। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে যেমন প্রচলিত আচারের সমর্থনে নিত্যনতুন আগম-পুরাণ-তন্ত্রের প্রক্ষেপ ঘটতে থাকে, তেমনি শৃঙ্খলা এবং নিয়ন্ত্রণহীন সমাজে শিক্ষার প্রসারও বাধাহত হয়। বিদ্যার প্রতি বাঙালির স্বাভাবিক আগ্রহ চিরকালীন; কিন্তু এই অন্ধকার যুগে সেই শিক্ষার জীবন-বিচ্ছিন্ন

হয়েছিল। শিক্ষার পরিমাপ এযুগে কিছুতেই পরিমাণগত নিরিখে হবার উপায় ছিল না। উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাঠশালায় পড়ুয়া বাঙালি ছাত্রের সংখ্যা নাকি ছিল ৮%, আর শিক্ষিত—অর্থাৎ লেখাপড়ায় সক্ষম ছিল ৬%।[৯] গুণগত বিচারেও মৌল বিদ্যা-চর্চার অপেক্ষা জীবন-বিবিক্ত আচার-আচরণে, এবং বিতর্কমূলক বিষয়ের চর্চাতেই আগ্রহ ছিল সমধিক। ঐতিহাসিক আক্ষেপ করেছেন,[১০] "যে-সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব্‌নিজ, বেকন প্রভৃতি মানুষের প্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙালীর মনীষা নব্য ন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্ তিথিতে কোন্ দিকে যাত্রা শুভ বা অশুভ এবং কোন্ কোন্ ভোজ্যদ্রব্য বিধেয় বা নিষিদ্ধ তাহার নির্ণয়ে, বাঙালীর ধর্মচিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়মাসব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।"

শুধু তাই নয়, দেশের মধ্যেই শাশ্বত জ্ঞানের যে বীজ নিহিত ছিল, তার প্রতিও বাঙালি মনীষা ছিল সম্পূর্ণ অনবহিত অথবা বিমুখ। আরবি-ফারসির মাধ্যমে প্রতীচ্য জ্ঞানের যে সম্ভার এদেশের মক্তব-মাদ্রাসায় একদা প্রসার লাভ করে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মধ্যযুগের বিনষ্টিকালের অধিকাংশ বাঙালি সে সম্পর্কে নিরঙ্কুশ হয়েছিল। এখানেও শেষ নয়, ভারতবর্ষীয় মননের আদিম উৎস বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রাদির অস্তিত্বের সংবাদ পর্যন্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছিল।

দেহ-মন-বুদ্ধির এই সর্বাত্মক জড়তা ও আবিলতা থেকে উত্তরণের প্রেরণা সূত্রেই বাঙালির 'নবজাগরণ'-এর উদ্ভব। আর যৌক্তিকতা-সমুখ মধ্যবিত্ত মানসিকতার উজ্জীবন যদি রেনেসাঁসের হাতিয়ার হয়, তাহলে শাশ্বত মূল্য-মহিমাদীপ্ত প্রাচীন জ্ঞান সম্পদের—জাতীয় classics-এর উদ্ভাবন, আর মননমাধ্যমে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস রেনেসাঁসের

৯ দ্র. তদেব—পৃ. ৩১৪
১০ তদেব—পৃ. ৩৩৩-৩৪

সাধারণ দুটি উপকরণ ও উপায়। এইখানেই বাঙালির রেনেসাঁস-এ রামমোহনের পুরোভূমিকা। উনিশ শতকে আমাদের জাতীয় নবজাগরণ ছিল ধর্ম ও সমাজ-চেতনা-ভিত্তিক; আধুনিক য়ুরোপের, বিশেষত ইংলণ্ডের রেনেসাঁসের মূলে যেমন ছিল অর্থ-রাজনৈতিক প্রেরণা। আর রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সেই ধর্মীয় উজ্জীবন ছিল বেদান্ত-জ্ঞান-গৌরবী। বেদ-বেদান্তই ভারতবর্ষের শাশ্বত আদি জ্ঞানের ভিত্তি,—অবিস্মরণীয় ক্লাসিকস্; তাকেই মন্থন করে নবীন জ্ঞানের শিখা জ্বালতে হবে, এই বিশ্বাসে ও প্রবণতায় বাঙালি বুদ্ধিজীবি-সমাজকে স্থায়িভাবে উদ্দীপ্ত, অভ্যস্ত এবং পরিচালিত করেছিলেন রামমোহনই। বৃহত্তর সমাজের পটভূমিতে তখন মন্ত্রতন্ত্র, তুক্‌তাক, আগম-পুরাণ অর্থহীন তর্ক ও প্রাণহীন আচার-বিচারের পুঁজিসর্বস্ব ন্যায়-স্মৃতির বিতণ্ডায় বাঙালি মনীষার অপচয় ঘটে চলেছিল নিরবধি। এমন পরিবেশে রামমোহন ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ, এবং আচার্য শঙ্কর-কৃত তার ব্যাখ্যা-ভাষ্যাবলিকে বাংলা ভাষায় পুনর্বিন্যস্ত করেছিলেন কেবল লোক-প্রবোধনের আকাঙ্ক্ষায়। দীর্ঘ অব্যবহারে অপরিচিত সেই শাশ্বত জ্ঞানালোক কুসংস্কারের অচলায়তনে ধাক্কা যখন দিল, জড়তাপীড়িত পণ্ডিতম্মন্যজনেরাও বিভ্রান্তি রচনার প্রয়াসে তখন হিতাহিতজ্ঞানরহিত হয়েছিলেন। এমন কথাও প্রচারিত হচ্ছিল যে,[১১] "উপনিষদ বলে সংস্কৃত ভাষায় কোনো শাস্ত্রই নেই, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নাকি তিনি (রামমোহন) রচনা করেছিলেন।" তার প্রতিরোধ চেষ্টায় জাগ্রতিব্রতী রামমোহনকে ঘোষণা করতে হয়েছিল, তাঁর কৃত শাস্ত্রানুবাদ ও ব্যাখ্যাদি যে সম্পূর্ণ মূলানুসারী তার প্রমাণস্বরূপ[১২] "সেই সকল ভাষা বিবরণের পুস্তক শত শত এই নগরে এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য

---

১১ প্রমথ চৌধুরী—'রামমোহন রায়' [প্রবন্ধ]—দ্র. প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম. পৃ. ১৭৭।
১২ রামমোহন রায়—'কবিতাকারের সহিত বিচার' রামমোহন রচনাবলী [হরফ প্রকাশনী]—পৃ. ২১২।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কলেজে এবং অন্য ২ পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে।”

এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে নবজাগ্রত বাঙালি সমাজে বেদান্ত শাস্ত্রই অবিসংবাদী আদর্শের দিশারি রূপে সার্বিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

বস্তুত রেনেসাঁসের অন্যতম স্থায়ী ভিত্তি পূর্বাপর ঐতিহ্যের স্বীকরণ; এবং সেই সূত্রে পুরাতনের নিত্যনবীকরণ। বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে এই প্রাকরণিক আভ্যন্তর শৃঙ্খলাও রামমোহনের মৌলিক সংযোজন। এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও-পন্থী ‘নব্যবঙ্গ’ দলের বৈপ্লবিক উদ্যমের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রধানত দেশীয় পূর্বসূত্রকে অস্বীকার করেই যুক্তি-প্রতিষ্ঠ নূতন চিন্তা-ভাবনার পত্তন তাঁরা করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত টবের গাছ যেমন, তেমনি শেকড় মেলবার বিস্তীর্ণ আশ্রয়টি হারিয়ে ‘নব্যবঙ্গ’ প্রয়াসের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। অন্যপক্ষে বহু ভাষাবিদ, এবং বহুমুখী বিদ্যার উন্মুখ সাধক রামমোহন তার বহু আগে থেকে, একেবারে প্রথম থেকেই, জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি সহজ সচেতনতা বশে আপন বক্তব্যের উপস্থাপনাভঙ্গিকে প্রচলিত নৈয়ায়িক রীতির অনুসারী করে তুলেছিলেন। নবজাগ্রত বাঙালির মননশীল আলোচনায় সেই ধারাই ক্রমশ ব্যাপক প্রচলন লাভ করে। রামমোহনের ভূমিকা এখানে কেবল ‘পথিকৃতের নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি।

যুক্তি-প্রণোদিত অনুসন্ধিৎসা, বিচার, ও অনুশীলন—‘র‍্যাশনালিটি’ —রেনেসাঁস-মর্জির এক প্রধান লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাঙালির সংস্কৃতিতে রামমোহন ছিলেন সেই প্রথম পরিপূর্ণ ধী-যুক্ত ব্যক্তিত্ব—‘র‍্যাশন্যাল পার্সোনিলিটি’; ইতিহাসের পরিবাহক নন কেবল, যথার্থ অবধারক। বাঙালির রেনেসাঁস ও র‍্যাশনালিটির প্রেরণারূপে আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রসঙ্গ বহুল আলোচিত হয়ে আসছে। টম্ পেইন-এর ‘এজ অব্ রীজন’ (১৭৯৪-৯৬) নিয়ে নব্যবঙ্গসমাজের ঝড়ো

উদ্দীপনা আজ প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত। কিন্তু তারও কত আগে নিছক স্বতঃপ্রণোদিত প্রেরণার বশে রামমোহন বলতে পেরেছিলেন,[১৩] "অভিজ্ঞতা থেকে দূরবর্তী এবং যুক্তিবিরোধী বিষয়সমূহে আস্থা স্থাপন বিচক্ষণ লোকেদের উপযোগী নয়।" এই স্পষ্টোক্তি ঘোষিত হয়েছিল ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'তুহ্ ফাত উল মুআহিদীন' নামক ইসলামি ভাষায় লেখা গ্রন্থে। টম্-পেইন-এর 'যুক্তির যুগ' তাঁর আগে লেখা হয়ে গিয়েছিল; এবং নিশ্চয়ই যুক্তিবাদী আরো বহু পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থও। তাহলেও বাঙালির নবজাগরণের দরবারে তাদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল অবশ্যই আরো অনেক পরে। অন্তত তুহ্ ফাত, রচনার কালে রামমোহন য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের সান্নিধ্য লাভ করেন নি, একথা মনে করবার প্রচুর কারণ আছে। জন ডিগ্ বি-র সরবরাহ করা তথ্যাদি থেকে জানা যায়,[১৪] ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইংরেজি ভাষা শিখতে প্রথম সচেষ্ট হন; ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেবল ততটুকুই এ ভাষা বলতে পারতেন, নিতান্ত সাধারণ বিষয়ের কথোপকথন যার ফলে বোধগম্য হতে পারত, শুদ্ধ ভাষা একেবারেই লিখতে পারতেন না। অন্যপক্ষে নগর বাংলায় ইংরেজি চর্চার ব্যাপ্তি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে; নব্যবঙ্গ দলও তারই ফসল। অথচ 'তুহ্ ফাত'-এ রামমোহন আরবি ফারসি তর্কবিদ্যানুমত শব্দাদির যথেষ্ট প্রয়োগ করেছিলেন,[১৫] কিংবা নিজেই তিনি স্বীকার করেছেন,[১৬] সংস্কৃত ভাষাতেও তখন তিনি পারঙ্গম হয়ে উঠেছেন। এসব সত্ত্বেও,

১৩ "...to put faith in the existence of such things as are remote from experience and repugnant to reason, is not in the power of a sensible man."—Tr. in English— Cf. Sophia Dobson Collet 'The life and Letters of Raja Rammohun Ray' [Ed.] Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguly p. 20.

১৪ Cf: Ibid pp. 23-24.

১৫ Cf: Ibid p. 18.

১৬ Cf: Ibid p. 19.

রামমোহনের সহজ ধীমত্তা প্রথমাবধি তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির উদ্ভাবনী জিজ্ঞাসাবশেই উৎসারিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। নিজেই দাবি করেছেন,[১৭] অতি অল্প বয়সে পূর্বপিতামহদের সাকার উপাসনা-পদ্ধতি পরিহার করেছিলেন। এবং তার সমর্থনে গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন। 'তুহ্ ফাত'-এর আগেও রামমোহন আরো কোনো আরবি ফারসি গ্রন্থ লিখেছিলেন কি না, অথবা 'মনাজারুতুল আদীআন' সেই গ্রন্থ কি না, এ-সব নিয়ে বিতর্ক অশেষ হতে পারে। কিন্তু রামমোহনের আমূল জীবন-প্রকৃতিটি যে কৈশোর কাল থেকেই আত্মসচেতন ও যুক্তি-সমর্থিত সত্যের অতন্দ্র অনুসন্ধানী ছিল, সে-বিষয়ে অমোঘ প্রমাণ রয়েছে তাঁর ব্যক্তিক প্রবণতার গভীরে।

কুলদেবতা বিষ্ণুর প্রতি নিষ্ঠা ছিল একদা আন্তরিক। কিন্তু দ্বিধা যখন, যে বয়সে এল, তখনো ইস্‌লাম কিংবা হিন্দু শাস্ত্রের বিদ্যা অধিগত করতে পারার মত মানস পরিণতিও ঘটে উঠবার কথা নয়। অন্যপক্ষে বাল্যকালে বিদ্যা আহরণের যে প্রথাগত প্রয়াসে রামমোহনের পিতা তাঁকে সকল একাগ্রতার সঙ্গে নিয়োজিত করেছিলেন, ব্যাবহারিক জ্ঞানার্জনই ছিল একাধিক শতাব্দী ধরে তার প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজভাষা ফারসির চর্চা করতে গিয়ে তিনি সুফি দর্শন ও রাহস্যিক কবিতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, আরবি শিখতে গিয়ে য়ুক্লিড্ ও এরিস্টট্‌লের, এবং ঐ একই সঙ্গে কোরাণ-এরও ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করতে পারেন। তার চেয়েও বড় কথা ইসলামিক জ্ঞানলোকে ব্যাপক পরিক্রমা শেষে রামমোহনের চিত্তবৃত্তি শেষ পর্যন্ত সবিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল যুক্তিবাদী মুতাজলি (Mutazali) এবং একেশ্বরবাদী মুআহিদীনদের প্রতি। অতি অল্প বয়সে নিজের পাঠ্য নির্বাচনে রামমোহনের স্বাধীন ভূমিকা হয়ত অল্পই ছিল, কিংবা মোটেই ছিল না,

---

১৭ Cf. Rammohun Ray—"An Appeal to Christian Public in Defence of 'The precepts of Jesus' " —The English Works of Raja Rammohun Ray [Sadharan Brahmo Samaj] Vol. V, p. 58.

কিন্তু অধীত বিদ্যার প্রতি তাঁর চিত্তবৃত্তি সেই অপরিণতির কাল থেকেই ধী-প্রচোদিত প্রতিক্রিয়া রচনা করতে পেরেছিল ; ঐখানেই তাঁর অনন্যতা। জগতের মূলীভূত কারণের অদ্বিতীয় অসীম নিরবয়ব সত্তা, শক্তিমত্তা এবং মানব কল্যাণে তাঁর নিরন্তর উন্মুখতার মৌল প্রত্যয় রামমোহনের যুক্তি-প্রতিষ্ঠ মনের স্বাধীন আবিষ্কার। পরবর্তীকালে আরবি-ফারসি, সংস্কৃত, ইংরেজি, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষার চিন্তাজগত মন্থন করে সেই যুক্তি-সমর্থিত মৌল সত্যের যথার্থতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন ; এবং সেই ধী-লব্ধ মানবিক জ্ঞানকেই সর্বসাধারণের অধিগম্য করার আগ্রহে একের পর এক নিবন্ধ রচনা ও আলোচনা করে গেছেন অক্লান্ত উদ্যমে। রামমোহন ও যুক্তি-বাদের এই বিকাশ প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা অনুধাবনীয় বিষয় হল, তাঁর যৌক্তিক প্রবণতা কোনো বহিরাগত শাস্ত্রজ্ঞান বা মনন-চিন্তনের প্রভাব-প্রসূত হয়ে আসে নি ; বরং আত্মানুভূত সত্য-অন্বেষণাকাঙ্ক্ষার অপরতন্ত্র প্রবণতা বশেই সকল অধীত বিদ্যা ও পূর্ব-চিন্তাকে তিনি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এই পদ্ধতিতেই মানবমুক্তির পরাকাষ্ঠা।

ইতিহাস আসলে মানবজীবন-প্রবণতারই তথ্যালেখ্য ; মানুষকে আশ্রয় করেই তার অভিব্যক্তি। কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রায় সর্বত্রই ইতিহাসের বাহক। 'রেনেসাঁসে'র দেশকালগত বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাবে কুসংস্কারমুক্তি, যুক্তিনিষ্ঠা ও মানবিক উজ্জীবনের যে সম্ভাবনা ধীরে ধীরে পুঞ্জিত হয়ে উঠছিল, হিন্দু কলেজের শিক্ষা, ডিরোজিও প্রভৃতির উদ্দীপনা, তার অনুকূল-প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া, সবকিছুর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে সেই ঐতিহাসিক লক্ষণ ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ; বাঙালির রেনেসাঁস-ইতিহাসের মুখ্য পরিবাহক এঁরা। কিন্তু এমন কোনো কোনো ব্যক্তিত্বও রয়েছেন, ইতিহাসের যাঁরা অবধারক। এই প্রসঙ্গেই ভগীরথের গঙ্গাবতরণের কাহিনী-রূপক মনে পড়ে। দুরায়ত্ত স্রোতোধারাকে মর্ত্য-সাধারণের মধ্যে প্রবাহিত

করে দেবার আগে তাকে সম্পূর্ণ অধিগত—অবধারণ করা আবশ্যিক হয়েছিল। রেনেসাঁসের বিচিত্রমুখ উচ্ছ্বাসের আবর্ত জাতীয় জীবনের পক্ষে আত্মঘাতীও হতে পারত ; কখনো কখনো হয়েছেও হয়ত তাই। কিন্তু ভালো-মন্দ অনুকূল-প্রতিকূল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণামে বাঙালির নবজাগরণ যে সামগ্রিক ঐতিহাসিক চরিত্রটি আজ আয়ত্ত করেছে, তার একটি নিটোল পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি রামমোহনের ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়েছিল। মনে হয়, বাঙালির শতাধিক বর্ষব্যাপী জীবন্মুক্তির ইতিহাস-পথে নিজের সমগ্র জীবনখানিকে পতাকার মত তুলে ধরে রামমোহন যেন আগে আগে হেঁটে গেলেন, বহুলাংশেই নিঃসঙ্গ, একক। 'ভারত পথিক' অভিধা সহযোগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই অগ্রপথিকের ভূমিকাতেই বরণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করি।

রামমোহন বাঙালি রেনেসাঁসের নিয়ামক কিংবা নেতৃপদ কতটা দাবি করতে পারতেন সে নিয়ে বিতর্ক অন্তহীন হোক্ ; কিন্তু আপন ব্যক্তি-চরিত্রের গভীরে রেনেসাঁসের সকল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে তিনি ধারণ করেছেন,—আপন জীবনের সাধনায় রেনেসাঁসের সকল লক্ষণকে গতি দান করেছেন, পরিপোষিত—বিকশিত করে তুলেছেন—এইখানেই বাঙালির নবজাগরণের সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক যোগ। সেই কথা দিয়েই আরম্ভ করেছিলাম, এই নবজাগরণের তিনি বিমূর্ত প্রকাশ,—বাঙালির 'রেনেসাঁস পার্সোনালিটি'। হিন্দু কলেজের পরিচালক-সমিতিতে তিনি ছিলেন কিনা, কিংবা কেন ছিলেন না, সেটা বড় কথা নয় ; হিন্দু কলেজ যে প্রয়োজনে কল্পিত হয়েছিল, তার সুস্পষ্ট ছবিটি রামমোহনের মনেই মুদ্রিত হয়েছিল, হিন্দু কলেজের পরিচালক-সমিতির সদস্যদের কাছে তেমনটি নয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে তার প্রাঞ্জলতম প্রকাশ। সারাজীবন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের জীবন-মূল্য প্রতিষ্ঠায় যিনি সর্বস্বপণ করেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের দৃঢ় সমর্থন সূত্রে

তিনিই আবার লিখেছিলেন,[১৮] "এমন কি সেই বেদান্ত তত্ত্বের মাধ্যমেও তরুণেরা উৎকৃষ্টতর সামাজিক হয়ে উঠতে পারেন না, যা তাদের বিশ্বাস করতে শেখায় যে সকল প্রত্যক্ষ বস্তুরই কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি রূপে তাদের কোনো সামগ্রিক সংজ্ঞা নেই, অতএব তাঁরা যথার্থ স্নেহ-ভালোবাসার যোগ্য নন, এবং যত দ্রুত আমরা এই জগৎ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি, ততই ভালো।" বেদান্ত শাস্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যালোচনা তদানীন্তন ভারতজুড়ে যে জীবন-বিমুখতার সঞ্চার করেছিল, শঙ্কর-ভক্ত বেদান্তসাধক রামমোহন কী প্রখর আন্তরিকতা সহকারে তার বিরোধিতা করেছেন! এই শঙ্কর-ভাষ্য অবলম্বনেই আত্মার অবিনাশিতা, পরমাত্মার প্রেমপ্রবণতাদির সূত্রে অবাধ জীবন-প্রেমকে তিনি উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। —বস্তুত এই নির্বন্ধন আত্মিক মুক্তি ও ব্যাপ্তি-ভাবনার পরিণামেই নিজে একদা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পেরেছিলেন ঐকান্তিক বিশ্বমানবতা-বোধের উপলব্ধিতে। তাঁর চোখে পার্থক্যটা আসলে ছিল মানসিক প্রবণতা ও যুক্তি-প্রয়োগের পদ্ধতিগত।

সহজ ধীশক্তির বলে রামমোহন বুঝেছিলেন, সমাজ তথা ব্যাবহারিক জীবন-বিমুখ পাথুরে বিদ্যাই অসাড়তার সৃষ্টি করে; প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জ্ঞানলোক মন্থন করে আন্তরিক বিচারলব্ধ এই উপলব্ধিকে তিনি পরিশীলিত এবং নিজের কাছে সুস্পষ্ট করেছিলেন। তাতেই সমকালীন ইতিহাসের দাবি অমন প্রখরভাবে তাঁর চোখে

---

১৮ "Nor will youths fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have no actual entity they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape them and leave the world is better.
রামমোহন রচনাবলী [পূর্বোক্ত] পৃ. ৪৩৫।

পড়েছিল ; জাতীয় নবজাগরণের প্রয়োজনে আধুনিক য়ুরোপের জীবনমুখী জ্ঞানচর্চার অনিবার্যতাবোধ হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য। এই কারণেই প্রতীচ্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষে, এবং অপরাপর সকল বিষয়েই তাঁর সকল উদ্যম ছিল এমন সর্বস্বপণ—আপসহীন।

হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক যাঁরা ছিলেন, নবজাগরণ-প্রয়োজনের এই হাতিয়ারটির অনিবার্যতা তাঁদের কাছে মোটেই স্পষ্ট ছিল না। আন্তরিক অনুমোদন ও প্রেরণার চেয়ে বিদেশী রাজ-পুরুষদের অনুরোধের জোর তাঁদের কাছে প্রবলতর হয়েছিল, নিজেদের স্বার্থ অপেক্ষা বিদেশীর আগ্রহকেই তাঁরা বড় করে দেখেছিলেন ; এবং সেই কারণেই হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যমে সহযোগিতা উপলক্ষে নানারকমের পূর্বশর্ত আরোপ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয় নি। যদি একথাও সত্য হয় যে, বিশেষভাবে সমসাময়িক হিন্দুপ্রধানেরা রামমোহনের সহযোগিতা অথবা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা—এর যে-কোনো একটিকে প্রত্যাখ্যান করার দাবি উত্থাপন করতে পেরেছিলেন, এবং তার উত্তরে রামমোহন নিঃশব্দে নিজেকে জীবনের অন্যতম প্রিয় প্রচেষ্টা থেকেও দূরবর্তী করে নিয়েছিলেন, তাতেই নেতৃত্ব এবং আত্মিক আগ্রহের চারিত্র-পার্থক্য স্পষ্ট হতে পারে।

সতীদাহ নিবারণের প্রসঙ্গেও একই কথা! রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান বাহন মানব-স্বাতন্ত্র্যে আন্তরিক আস্থা। প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-নির্ভর শিক্ষার প্রতি রামমোহনের আগ্রহের মূলে ছিল সংস্কারমুক্ত স্বাতন্ত্র্যবোধে বাঙালির জড়তাবিদ্ধ চিত্তকে উদ্বোধিত করা ; তেমনি সতীদাহ-প্রসঙ্গেও নারীর অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র বিকাশই ছিল তাঁর পরিণামী লক্ষ্য। সতীদাহ-প্রবর্তকের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা[১৯]—স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে

১৯ রামমোহন রায়—'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'। রামমোহন রচনাবলী [পূর্বোক্ত] পৃ. ২০২।

লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কি প্রকারে জানিলেন?" শিক্ষার প্রকর্ষলব্ধ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ও নিয়োজনই নবজাগরণের স্বাভাবিকতম পন্থা—এ বিশ্বাস যুক্তিবাদী রামমোহনের অন্তরে দৃঢ়মূল ছিল। কল্যাণকর উদ্দেশ্যেও পীড়ন ও শক্তিপ্রয়োগের বিপরীত পরিণাম সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীন ছিলেন; বিচার-বিতর্ক মাধ্যমে স্বাধীন মনোবৃত্তির উদ্বোধন ও আনুকূল্যের সহযোগেই জাতীয় জীবনের জড়তামুক্তি ও সংস্কার সাধনের প্রয়াস তাঁর আদর্শ ছিল। অতএব রাষ্ট্রশক্তির জোরে সতীদাহ নিবারণের পরিকল্পনা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এ-বিষয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক-কে ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন,[২০] "সতীদাহ সম্পর্কিত আইন প্রচলিত করলে সাধারণচিত্তে শঙ্কা দেখা দিতে পারে যে,—ইংরেজেরা যখন (এদেশে) ক্ষমতালাভের প্রয়াসী ছিলেন তখন তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে সার্বিক সহনশীলতার অনুমোদন কূটনীতিসিদ্ধ মনে করেছিলেন, কিন্তু (সে বিষয়ে) প্রাধান্য অর্জনের পর তাঁদের প্রথম কাজই হল পূর্ব-রীতির অন্যথাচরণ এবং সম্ভবত পরের স্তরই হবে মুসলমান বিজয়ীদের মত আমাদের ওপরে তাঁদের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া।"

২০ "While the English were contending for power they deemed it politic to allow universal toleration and to respect our religion, but having obtained that supremacy their act is a violation of their profession, and the next will probably be, like the muhammadan conquerors, to force upon us their own religion."—

Cf. Sophia Dobson Collect—'The Life and Letter of Raja Rammohun Ray' [opcit.] p. 257.

ঐতিহাসিক বলেছেন,[২১] রামমোহনের এই সিদ্ধান্ত যথাকালে সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, সিপাই-যুদ্ধের কালে বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ধূমায়িত করবার পক্ষে এই ঘটনাও এক শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার জুগিয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের আপত্তির কারণ তাঁর 'রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্বে'র আরো গভীরে নিহিত ছিল বলেই বিশ্বাস করি। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকার প্রারম্ভিক ছত্র কয়টি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে,[২২]—"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরেজদের অধিকার হইয়াছে [।] তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা [।] পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের না [,] সেইরূপ মিসনারিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামী রূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন [।] কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের

২১ Cf. 'The Life and Letter of Raja Rammohun Ray'—Ibid pp. 257-258.

২২ রামমোহন রায়—'ব্রাহ্মণ সেবধি' দ্র. রামমোহন রচনাবলী (পূর্বোক্ত) পৃ. ২৩৩।

নামমাত্র লোকে ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না [,] যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন [।] তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না।"

এ উক্তি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ; প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে মানবিক যুক্তির অবতারণা। আর সতীদাহ-বিষয়ক পূর্বোল্লিখিত অভিমত প্রকাশিত হয়ে থাকবে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ; এবারে প্রসঙ্গ ছিল রামমোহনের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের একান্ত অনুকূল ! অথচ উভয় ক্ষেত্রেই সাত বছরের ব্যবধানেও নিছক যুক্তিধারাই নয়, তার প্রকাশভঙ্গী—তথা বাক্‌রীতিও কি আশ্চর্য পরিমাণে অভিন্ন ! এর থেকেই বুঝি, আসলে এ কেবল কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে উচ্চারিত যুক্তি অথবা অভিমত নয় ; রামমোহনের অন্তঃসত্তার পক্ষে এ-ছিল মৌলিক ধ্রুব প্রত্যয়। পরাধীন, দুর্বল মানুষের প্রতি স্বাধীন-সবলের শক্তি প্রয়োগে মানবিকতার—মানুষের আত্মকর্তৃত্ব-অভিলাষী মৌল সত্তার—অপঘাত ঘটে ; কেবল নির্জিতের ক্ষেত্রে নয়, নির্যাতনকারীর বেলাও। দুর্বলকে দুর্বল জেনেও পরাভূত করার আগ্রহে সবলেরও পক্ষে আন্তরিক কাপুরুষতারই কেবল চরিতার্থতা সাধিত হয়।

আসলে মানবিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতি অবিচল আস্থা, মানুষের শক্তিকে আত্মকর্তৃত্বে স্বাধীন সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেখার আগ্রহ ছিল রামমোহন-ব্যক্তিত্বের মুখ্যতম আকাঙ্ক্ষা। অতএব যে-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেয়েও মানবিক প্রমূল্যের প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর অধিকতর কাম্য ; কিংবা বিপরীতভাবে বলা যেতে পারে, সকল কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়েই রামমোহন চরম মানব-মুক্তি সাধনেরই চেষ্টা করে গেছেন। আধুনিক আদর্শে শিক্ষার সংস্কার থেকে সতীদাহ নিবারণ, নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থেকে ফরাসি বিদেশ-

মন্ত্রীকে লেখা চিঠি পর্যন্ত সর্বত্র একই অভিন্ন উদ্দেশ্য ও আদর্শ কাজ করেছে। আর আসলে মানব-মহিমার সর্বাত্মক মুক্তি-বিধানের এই মৌল উদ্দীপনা সূত্রেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে রেনেসাঁস-এর উদ্ভব ও প্রসার।

কিন্তু আদর্শ ও উদ্দেশ্যের এই সমতা সত্ত্বেও মানব-মহিমার স্বরূপ এবং মানব মুক্তির প্রকরণ নিয়ে ধারণা ও প্রযুক্তির পার্থক্য দেখা দিয়েই থাকে; এই সূত্রেই রেনেসাঁসের ইতিহাস-চরিত্র বিভিন্ন দেশকালের প্রভাবে স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য অর্জন করে; এই কারণেই ইতালির রেনেসাঁসের তুলনায় আধুনিক য়ুরোপের রেনেসাঁস অনেকাংশে স্বতন্ত্র-প্রকৃতি; এবং বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ ও আধুনিক য়ুরোপের জাগরণ—একই ইতিহাসের প্রতিলিপি নয়। আর আগেও বলেছি, আমাদের নবজাগরণের ইতিহাসের ধ্রুবপদটি রামমোহনের জীবন-সাধনার রচনা; সবটাই সচেতন নির্মিতি হয়ত নয়, কিন্তু এক যুগন্ধর জীবনকে ঘিরে আসলে সে ইতিহাস-বিধাতার আপন হাতের সৃষ্টি!

বিশেষজ্ঞ বলেছেন,[২৩] "মানবভাবনার ক্ষেত্রে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে 'সেক্যুলারিস্‌ম্ ও য়ুনিভার্সালিজম' রামমোহনের দান বলে অভিহিত হতে পারে।" বস্তুত মানুষের মৌল অস্তিত্বে নীতি-চেতনা এবং চিন্তাগত উপাদানের দুর্বলতা ও অসংগতি রয়েছেই; ঐটুকু তার জৈব ধর্মের ফল। আর এই দুর্বলতা মোচন, তথা মানবিক অনুভূতি, উদ্ভাবনা ও অন্তর্দৃষ্টির (perception, imagination and intuition) অনন্যপর চরম পরিমার্জনা বিধানই মানবিক মহিমার বিকাশ ও মানব-মুক্তির প্রকরণ। অন্তত রামমোহন আন্তর

২৩ "In modern terminology Rammohun's Contribution to human thought may be described as secularism and universalism."—Nirmal Chandra Sinha—'Rammohun and the Indian Tradition'. Cf. Nihar Ranjan Ray [Ed.] 'Rammohun Ray'. p. 93.

স্বভাববশেই এই পন্থার অনুসারী হয়েছিলেন। অন্যপক্ষে আধুনিক য়ুরোপের মানব-সচেতনতা ছিল মানবিক শক্তি এবং অধিকার-বোধে উজ্জীবিত ; বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থ-রাজনৈতিক প্রমুক্তি অর্জনের আগ্রহ ও কল্পনায় উদ্দীপ্ত। রামমোহন কিন্তু ক্ষমতা ও অধিকারের চেয়ে আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার বিস্তার ও উন্মোচনের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখানেই তাঁর প্রয়াস ও পদ্ধতি আধ্যাত্মিক।

অর্থাৎ জৈবতা থেকে মানবিক প্রমুক্তির পথ যদি খুঁজতেই হয়, তার উৎস মানুষের ভেতরেই খুঁজতে হবে। আর সেই সন্ধানে রামমোহন তাঁর প্রবণতার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পেয়েছিলেন ভারতীয় ক্লাসিকস-এই—বেদান্ত শাস্ত্রে। আগে বলেছি, আচার্য শঙ্করানুমোদিত বিচার-ব্যাখ্যান সূত্রে জীব ও জগতের পরিণতি সম্পর্কে তিনি আপন পরিণামী প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন, সেই একই সূত্রেই এক বিশেষিত বিশ্বমানব-ভাবনায় তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল।[২৪] "রামমোহনই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথমতম কূটনীতিবিদ্ যিনি জাতি-ধর্মের সকল বেড়া অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিক ঐক্যের কথা ভাবতে পেরেছিলেন।"

জগতের স্রষ্টা, পাতা ও কল্যাণকর্তা এক এবং অদ্বিতীয় অমোঘ শক্তির পরিকল্পনা রামোহনের এই বিশ্বজাগতিক ঐক্য-চিন্তার ভিত্তি রচনা করেছিল। তার পটভূমিটি গড়ে তুলেছিল বেদান্ত শাস্ত্র। শাঙ্কর ভাষ্যের অনুসরণ রামমোহনকে বৈরাগী করে নি, অক্লান্ত কর্মযোগী করেছিল। "যথোক্তান্যপি কর্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।" মনুসংহিতার (১২/৯২) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামমোহনের উপলব্ধি,[২৫]—"এই মনু বচনে 'শম'

২৪ "Rammohan is possibly the first statesman anywhere in the world, to have crossed the barriers of race and religion and to have thought of an essential unity in the hopes and aspirations of mankind."—Ibid, p. 92.

২৫ রামমোহন রায়—'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ'—রামমোহন রচনাবলী (পূর্বোক্ত) পৃ. ৩৩২।

ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ ও ত্বক এই পর্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিপ্ল না জন্মে।

"দ্বিতীয় উপায়, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাস, অর্থাৎ প্রণব 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থচিন্তন ইহাতে যত্ন করিবেন।"

বস্তুত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শাঙ্কর বেদান্তসিদ্ধ বিশ্বমানুষ রামমোহনের চলিষ্ণু ব্যক্তিত্বের এই অপরূপ পরিচয়টি অতুল্য বিশ্লেষণে উজ্জ্বল করেছেন।[২৬] ব্রহ্ম ও জীব মূলত অভিন্ন; জগৎ প্রপঞ্চ, এবং মায়াবশেই জীব ও ব্রহ্ম-র পার্থক্য সূচিত হয়। জ্ঞানের উদ্ভাবনে ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয় নির্গুণ পারমার্থিক সত্তা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যখন স্বচ্ছ হয় এবং পার্থক্যচেতনার বন্ধন থেকে যখন মোক্ষলাভ ঘটে, তখনই মায়া-প্রপঞ্চের অবসান ঘটে, জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই জ্ঞান-মোক্ষ লাভের প্রয়োজনে জীবকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হতে হয়। আর সেজন্য এই জগৎকে বর্জন নয়, তার ব্যাবহারিক মূল্যে সুশৃঙ্খল আচরণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতি, তথা বিশ্বনিয়ম ব্রহ্ম-প্রবর্তিত নিজস্ব নিয়ম, মানুষের কর্তব্য হল সেই নিয়মের পালন ও অনুসরণ। স্বভাবতই রামমোহন কেবল উপাসনা নয়, নিষ্কাম কর্মের ওপরেও জোর দিয়েছিলেন। রামমোহন-অনুসারীরা মহানির্বাণ তন্ত্রের সেই শ্লোকটির অনুধ্যান করেছেন:[২৭]

২৬ Cf.—Brajendra Nath Seal—'Rammohun Ray: The Universal Man.'—'The Father of Modern India'—opcit. pp. 95-109.

২৭ মহানির্বাণ তন্ত্র—অষ্টমোল্লাস (৮।২৩)। 'মহানির্বাণ'-এর পাঠ:—
"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাদ্ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যদ্ কর্মপ্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"
পূর্বে উদ্ধৃত পাঠ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে রয়েছে। রামমোহন-অনুসারীরা, রবীন্দ্রনাথও, প্রথম-ধৃত পাঠ ব্যবহার করেছেন।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

রামমোহনের স্বভাবগত প্রবণতা ছিল আরো জোরালো,—কেবল কৃতকর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করা নয়,—ব্রহ্মার্পিত চিত্তে অক্লান্ত কর্ম করে যাওয়াই ছিল তাঁর জীবনব্রত। আচার্য শীল বলেছেন,[২৮] "রামমোহনের ব্রহ্মবিদ্যা জগৎ ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে তাঁর ভাবনাসূত্রে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদকে একত্র-সংহত করেছিল।" এ-সিদ্ধান্ত জগজ্জ্যোতি দার্শনিকের; ইতিহাসের তথ্যও তাঁর এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে[২৯], "ঈশ্বরের ওপরে ঝোঁক তাঁর অদ্বৈতচিন্তাকে সমন্বয়ী, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব করে তুলেছিল।" রামমোহনের—তথা বাঙালির রেনেসাঁস-কালের মানব-চেতনায় তারই প্রভাব বিচ্ছুরিত হয়েছে।

তাহলেও তাঁর প্রচেষ্টাকে 'সেক্যুলার' বলতে বাধা নেই। আজ আমরা 'সেক্যুলার' শব্দের অর্থ করে থাকি 'ধর্মনিরপেক্ষতা', আসলে মনে মনে ভাবি ধর্মহীনতা। মৌল তাৎপর্যে কিন্তু শব্দটি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা যাজকীয় নীতিবন্ধন থেকে মুক্তির দ্যোতক; —অবশ্যই মানবিক মুক্তির। রামমোহনের চোখে ধর্মের দু'টি রূপ ধরা পড়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মের! তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, জগতের আদিকারণ, এবং তৎপ্রসঙ্গে আত্মার স্বরূপ ও ভূমিকা সম্পর্কে সকল ধর্মই মূলত অভিন্নমত। কেবল যাজকদের নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতাবোধ-সিদ্ধ আচার-আচরণই বিরোধ এবং বিচ্ছেদের কারণ হয়। তা না হ'লে সর্বত্রই পরমাত্মার একমেবাদ্বিতীয়ত্ব, তাঁর সত্যপ্রতিষ্ঠ আধ্যাত্মিক

---

২৮ "...it would be correct to say that the Raja's Brahmavidya comprehended Visistadaita and Dvaita in his attitude towards the world and the individual soul." Cf.—Brajendra Nath Seal—Opcit. P. 100.

২৯ "His emphasis on Iswara made his monism sympathetic, concrete, and practical"—Ibid, p. 100.

উপাসনা, তথা আত্মার অমরতাবোধের, তার অবাধমুক্তির বাতাবরণ বিরাজ করছে। বস্তুত এই তুলনামূলক ধর্মালোচনার সূত্রেই রামমোহন বিশ্বমানবমুক্তির প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যাজকীয় সংকীর্ণ ব্যাবহারিকতা-নিরপেক্ষ বিশ্বধর্মের সাম্য এবং একতার সিদ্ধান্ত তাঁকে বিশ্বমানবতা-বোধে উত্তীর্ণ করেছিল। এই মৌল প্রত্যয় বশেই আত্মীয়সভার জন্ম ;—মানুষে মানুষে মুক্ত আত্মার একতাবন্ধন—এই প্রত্যয়ের জোরেই সিল্ক বাকিংহামকে তিনি অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন'[৩০] "বর্তমান অবস্থায় নিওপলিটাদের স্বার্থকে আমার নিজের বলে মনে করছি এবং তাদের শত্রুকে ভাবছি আমাদের শত্রু। স্বাধীনতার শত্রু এবং যথেচ্ছাচারের বন্ধুরা কখনোই সফল হতে পারে নি, কিংবা ভবিষ্যতেও কখনো সফল হবে না।"

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রামমোহন যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন প্রচলিত শাস্ত্রাচারের সংকীর্ণতা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির আলোকে পথ দেখে দেখে। পরবর্তীকালে অধ্যয়ন ও পরিশীলিত মননের ফলে ক্রমশই দেখেছেন, ধর্ম নয়, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল সমাজেই শাস্ত্রাচার মানুষের মন-বুদ্ধি-স্বকর্তৃত্বচেতনার মুক্তিপথে অন্ধকুসংস্কারের প্রাচীর গড়ে গড়েই চলে। অতএব মানবিক বিচারবুদ্ধি—ব্যক্তি মানুষের কার্য-কারণাত্মক সংগতি-অসংগতিবোধের আদর্শের ওপরেই তিনি নব-জাগরণের ইমারতটি গড়তে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর বাস্তব-চেতনার কাছে একথাও অস্পষ্ট ছিল না যে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার-বুদ্ধিরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এইখানেই একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-নির্ভর 'নব্যবঙ্গ'-ভাবকদের সঙ্গে ছিল রামমোহনের তফাৎ। সংঘবদ্ধ ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-চেতনা,

৩০ "Under these circumstances I consider the cause of the Neopolitans as my own, and their crimes as ours. Enemies liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful." —রামমোহন রচনাবলী [পূর্বোক্ত] পৃ. ৪৫৫।

এই উভয়েরই মূলগত সীমাবদ্ধতা মোচন করতে রামমোহন পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে যোজিত করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন,[৩১] মানুষের নীতিচেতনা এবং প্রজ্ঞামূলক উপাদানের অনিশ্চয়তা ও দুর্বলতার দরুন "ব্যক্তিগত বিচারবোধ অথবা শাস্ত্র-শাসন কোনোটাই (এককভাবে) জীবনের পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়।" তাই তাঁর অনুসৃত পন্থায়[৩২] "ব্যক্তিগত যুক্তির আলো-কে সমবেত জাতীয় প্রজ্ঞার ভাণ্ডার-রূপ শাস্ত্র-শাসনের সঙ্গে মানিয়ে মিলিয়ে নেবার" প্রবণতা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যোজনা করেছিল। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি এই সমন্বয়মূলক শৃঙ্খলার সূত্রে অতি সাবধানে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন।

আর এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার মাধ্যম হিসাবেই তিনি বাণীর আশ্রয়ও গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর সকল ভাষাচর্চার একটিই আদর্শ,—বাঙালির বৃহত্তর জীবনে নবজাগরণের আলোক উদ্ঘারিত প্রসারিত করে দেওয়া! এক্ষেত্রে রামমোহন 'লোক'-প্রবোধনের কথা ভেবেছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থে'র 'ভূমিকা' এবং 'অনুষ্ঠান' থেকে আরম্ভ করে উপনিষদাদির অনুবাদ প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ 'লোক' শব্দের ব্যবহার করেছেন; 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে অনুযোগের সুরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,[৩৩] "সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন [।] কিন্তু প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং

---

৩১ "Neither reason nor authority is sufficient for the guidance of life..." – Brajendra Nath Seal—Ibid, pp. 100-101.

৩২ "...the light of individual reason had to be reconciled with the authority of the scripture "—Ibid, p. 100.

৩৩ রামমোহন রায়—'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'—দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী (পূর্বোক্ত) পৃ. ১০৭।

তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় [।] অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকা প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।" আর বলা বাহুল্য, 'লোক' অর্থে রামমোহন রায় আসলে বিচার-বিবেক-সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের কথাই ভেবেছিলেন—তাঁদেরই সার্বিক বিকাশ ও উজ্জীবনে তিনি ছিলেন সমর্পিত প্রাণ।

অতএব দেখি, রামমোহন প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, সমাজ-জীবনই মানবিক নবজাগরণের ভিত্তিভূমি ; সামাজিক মানুষের সার্বভৌম জীবনে ঐতিহ্য সম্পদের গ্রহণ-বর্জনমূলক বিচারসূত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র প্রজ্ঞার উদ্ভাবনের চেষ্টাই তাঁর সকল ভাষা-কর্মকে সঞ্জীবিত করেছিল। আর বাংলা ছিল রামমোহনের মাতৃভাষা। আরবি, ফারসি, ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষাকেও তিনি আপন বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেছিলেন। আগেই বলেছি, রামমোহন বিশ্বধর্মের চর্চাসূত্রে ধীরে ধীরে বিশ্বমানুষ হয়ে উঠেছিলেন ; বাংলা ভিন্ন অপরাপর ভাষায় তাঁর রচনা-আলোচনা বৃহত্তর বিশ্ব-সংসর্গের পথ প্রসারিত করেছে—নিজের অন্তরে এবং বাইরেও। কিন্তু লোক-প্রবোধনের নবজাগরণিক মৌল উদ্দেশ্যের পক্ষে সে ছিল কেবল প্রাসঙ্গিক। এদিক থেকে তাঁর বাংলা ভাষা-রচনাবলির মূল্য অনন্য। জাতির তথা সমাজের নবজাগরণের মধ্য দিয়ে মানবিক প্রমুক্তির আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন—আর প্রধানত তাঁর বাংলা লেখাই 'লোক'-সাধারণের বোধসৌকর্ষের উদ্দেশ্যে কল্পিত—সমর্পিত হয়েছিল। এই তাৎপর্যেই বাংলার নবজাগরণ-সূত্রে রামমোহনের ভাষারচনার যথার্থ প্রাসঙ্গিকতা—বাঙালি রেনেসাঁসের এক ধারালো হাতিয়ার হিসাবে। সেই প্রাসঙ্গিকতায় বিধৃত করেই এবারে রামমোহনের বাংলা রচনাচরিত্রের পরিচয় সন্ধানে বৃত হওয়া যেতে পারে।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য :—'বাংলা সাহিত্যে রামমোহন'।

———

২

বাংলা সাহিত্যে রামমোহন

বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সমকালেই পরস্পরবিরোধী অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল; এবং দুটি আলোচনাই ছিল শ্রদ্ধানুকূল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে—রামমোহন তখনো কলকাতায় স্বমহিমায় দীপ্যমান—কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিখেছিলেন[১] —"বাংলা গদ্যের প্রথম বিশুদ্ধ রচনা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রসাদ রায়ের প্রকাশনার পরবর্তী,—বাবু রামমোহন রায় ও তাঁর ধর্মীয় প্রতিবাদীদের প্রকাশিত পুস্তিকাবলি। কিন্তু যেহেতু তাদের চরিত্র বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস-প্রভাবে বিতর্কমূলক, আর সেই কারণেই সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়, সেইজন্য নিঃশব্দে আমরা তাদের এড়িয়ে যাব।"

তার পনেরো বছরের মধ্যেই,—রামমোহনের তিরোধানের বারো

১ "The first works correctly written in Bengallee prose, which are subsequent to those published by Mrittunjaya Vidyalankara and Haraprasad Roy, are the pamphlets published by Baboo Rammohun Roy, and his opponents in religion; but as they bear the character of controversies on the different points of faith, and do not therefore come under the head of literature, we shall pass over the min silence…" [Cf. Jatindra Kumar Majumdar (Ed.) 'Raja Rammohun Roy and Progressive lovements in India' p. 277].

বছর পরে কিশোরীচাঁদ মিত্র লেখেন,[২] "....দেবতা, মহর্ষি এবং ঋষিগণের ভাষা সংস্কৃত কিছুতেই বৃহত্তর হিন্দুসাধারণের জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হতে পারে না....। এ-সব কথাই রামমোহনের জানা ছিল; তাই তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। আর তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যবশে সর্বোচ্চ প্রত্যাশাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।"

অতএব একটি অভিমত, রামমোহন বাংলা গদ্যের প্রথম বিশুদ্ধ রূপকার হলেও তাঁর রচনা বিষয়বৈশিষ্ট্যে সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। আর একজন ভাবেন, রামমোহন বাংলা ভাষায় (গদ্যে) প্রথম সাহিত্য স্রষ্টা। আর আসলে এ-দুটোই ধারণা বাংলা সাহিত্য ও রামমোহন সম্পর্কে সমান সত্য; কোনো অতিকাল্পনিক তাৎপর্যে নয়, তথ্য-সমর্থিত আক্ষরিক অর্থে। এই আপাত অসম্ভবের রহস্য সন্ধান নিয়েই আরম্ভ করা যাক্।—

সাহিত্য অর্থে সাধারণত আমরা বুঝি বাগর্থ-নির্ভর শিল্পকর্মের অনির্বচনীয় অভিব্যক্তিকে। রামমোহনের কোনো রচনাতেই শিল্প-গুণ কিংবা অনির্বচনীয়তার আবেদন বিন্দুমাত্র উপস্থিত নেই। পদ্যাকারে ৩২টি ব্রহ্মসংগীতও তিনি লিখেছিলেন; কিন্তু গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে সকল লেখাতেই তাঁর একমাত্র ঝোঁক ছিল বাগর্থ-বন্ধনের দৃঢ়তা-নিঃসারী স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা,—তীক্ষ্ণ একাগ্র দ্ব্যর্থহীনতা। এদিক থেকে, মনে করতে বাধা নেই, রামমোহনের রচনা ছিল সাহিত্যের প্রথা-সিদ্ধ চারিত্র-বিরোধী।

তাহলেও সঠিক অনুধাবন করলে বোঝা যাবে, প্রচলিত স্থূল সংস্কারের মধ্যে সাহিত্যের যথার্থ প্রকৃতি প্রচ্ছন্নই হয়ে আছে।

---

২ "...the language of the gods, the mohorshis, and the rishis—can never be the medium of imparting instruction to the great mass of the Hindus,···All this was known to Rammohun Roy. He therefore undertook to create a Literature in Bengali, and his exertions were crowned with a success that exceeded the most sanguine expectation." Cf. Ibid—p. 279.

সাহিত্যের জন্মমূলে আসলে প্রেরণা যোগায় মানবচেতনার অন্তর্নিহিত এক আত্যন্তিক অভিপ্রায়, আর সেই অভিপ্রায়ের যথাযোগ্য প্রকাশের সূত্রেই তার রূপমূর্তি গড়ে ওঠে। মানুষের পক্ষে সহজ—অপ্রতিরোধ্য সেই অভিপ্রায়ের পরিচয় রবীন্দ্রনাথও নানা সূত্রে ব্যক্ত করেছেন,[৩] "আমাদের যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না।" উদ্ভিদ্ কিংবা জীবের জগতে অভিব্যক্তি আসলে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত এক স্বতস্ফূর্ত পদ্ধতি; গহন অরণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্রের সঙ্গে বিচিত্রিত সুন্দর হরিণশিশুও লাফিয়ে বেড়ায়, কিংবা বনস্পতি মহীরূহের অন্ধকারে দল মেলে ধরে লতার বৃন্তে অপরূপ নিঃসঙ্গ ফুলের কোরক। কিন্তু মানুষের সাজসজ্জা—দেহ-মনের সকল স্তরেই—অপরের মনোলোভা। অথচ সব মানুষই সব কিছুতে লুব্ধ হতে পারে না; ব্যক্তিগত রাগ-বিরাগ—ব্যক্তিগত রুচির অনুসারে আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য ঘটেই থাকে। এই সূত্রেই আমাদের আলংকারিকেরা বলেছেন, সাহিত্যের উপভোগ,—তথা রসের আস্বাদন 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী'। রামমোহন কদাচ রসের কারবারি ছিলেন না; চিত্তবৃত্তির 'আস্বাদন' নয়, বুদ্ধিবৃত্তির বিবোধন ও বিবর্ধনই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। এবং এই কারণেই, অর্থাৎ মৌল রসশূন্যতার দরুনই কালীপ্রসাদ রামমোহনের রচনাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি।

কিন্তু সাহিত্যিকের একমাত্র কাজ কেবল রসসৃষ্টি করাই নয়, যুগন্ধর শিল্পীরা রসিকের সৃষ্টিও করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,[৪] "একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। ····লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ। তাই বলিয়াই যে সেটাকে কৃত্রিম বলিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।

৩ রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্য'। রবীন্দ্র রচনাবলী ৮, পৃ. ৩৭২।
৪ রবীন্দ্রনাথ—তদেব, পৃ. ৩৪৩।

মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলিবার বাধা দেখি না।"

এ-সব কথাই রসসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক। কিন্তু রামমোহনকে এ-বিষয়ে কোনো যুক্তিতর্ক কৈফিয়তের অবতারণাই করতে হয় নি; প্রথমাবধি তিনি অকুণ্ঠ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, তাঁর সকল রচনারই একমাত্র উদ্দেশ্য লোক-প্রবোধন; তাঁর সব লেখাই পাঠকদের জন্য।[৫] পাঠককে আকর্ষণ করবার সহজতম পন্থা প্রচলিত রুচি এবং রীতির অনুবর্তন; এমন কি অধিকাংশ রসশিল্পীও তাই করে থাকেন। দৈবাৎ দু-একজন লেখক আসেন যাঁদের উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষা জগৎ-ছাড়া, অভিনব। প্রচলিত রস-সংস্কার তাঁদের রচনায় কেবল ধাক্কাই খায়; তাই প্রথমাবধি প্রতিরোধ এবং আঘাত সহ্য করেই তাঁদের এগোতে হয়, যতদিন না নিজের শক্তিতে নূতন রুচি, নূতন প্রত্যাশা তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন। বাংলা কাব্যে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথও এই অভিজ্ঞতাকে যথাকালে এড়াতে পারেন নি; বরং ধাক্কা খেয়ে এবং ধাক্কা দিয়েই তাঁরা নূতন রস-বাসনা তৈরি করতে পেরেছিলেন। রামমোহন রসশিল্পী না হয়েও নতুন পাঠক-চেতনা গড়ে তোলার সচেতন সাধনায় সর্বপ্রথম লেখনী ধারণ করেছিলেন; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এখানেই তাঁর অনন্যতার প্রথম ভূমিকা।

আর বলা বাহুল্য, সে ভূমিকা গদ্যরচনার সূত্রেই। অথচ আমরা সকলেই জানি, গদ্য ভাষার উদ্ভব কোনো কালেই সাহিত্য রচনার প্রেরণা থেকে নয়; ব্যুৎপত্তিগত অর্থে[৬] সাহিত্যের প্রবণতা 'সহিতত্ব', তথা মানুষে মানুষে ব্যাপক 'মেলবন্ধন' গড়ে তোলে।

---

৫ দ্রষ্টব্য:—'বেদান্ত গ্রন্থ'—ভূমিকা; রামমোহনের প্রায় সকল রচনাতেই এরূপ উল্লেখ আছে। বর্তমান আলোচনায় বহু স্থলে সে বিষয়ে আরো প্রমাণ উপস্থাপিত হবে।

৬ দ্র. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গীয় শব্দকোষ'—দ্বিতীয় খণ্ড [সাহিত্য আকাদমি] পৃ. ২২১১।

অথচ ভাষার প্রথম জন্ম হয়েছিল সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যাবহারিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে। সে ছিল গদ্য ভাষা। কিন্তু প্রয়োজন নির্বাহের বাহনের ওপরে ভর করে প্রয়োজনের অতীত মনোবাসনাকে প্রসারিত করবার দাবি যখন কালে কালে দেখা দিল, কাজ সারবার হাতিয়ার লাগল মন ভোলাবার—মন ভরাবার কাজে, তখন প্রথম দৃষ্টিতে গদ্য ভাষাকে অনির্ভরযোগ্য বলেই মনে হল। তাইতেই তৈরি হল পদ্যের ভাষা, মনের সঙ্গে মনের উপলব্ধি-অনুভবের সংযোগসেতু রূপে।

ধরা যাক, সাত ভাই আর এক বোন নিয়ে একটি বাস্তব সংসার। ভোরবেলা পুব আকাশে লাল সূর্যের আভা যখন জেগেছে, বোনটি জেগে উঠে দেখলে ভায়েরা তখনো ঘুমে অচেতন। ডাকলে, 'ও ভাই, জাগো সবে'; ঘুম জড়ানো স্বরে ওপাশ থেকে জবাব এল, 'ডাক্‌ছ কেন বোন্!'—বোন নিশ্চয় তারপরেও একটা কারণ দেখিয়ে জেগে ওঠার জন্যে তাড়া লাগাবে। আর ভায়েরা জেগে উঠলেই তার কাজ সারা! কিন্তু এই কাজকর্মের ভিতর দিয়েই ভায়েতে বোনেতে মমতার যে অদৃশ্য বাঁধন গড়ে ওঠে মনে মনে, এই কথা-বার্তার ভাষায় তার যথাযোগ্য অভিব্যক্তি ঘটবে কি করে? কিংবা সেই মনোহরণ অনুভবটির,—ভাইবোনের স্নিগ্ধ সম্পর্কের সৌন্দর্যকল্পনায় যে মগ্ন হয়ে থাকে! সেই সুন্দরের—সেই অনির্বচনীয়ের ছোপ দিয়ে গদ্য কথাকে পদ্যের আভরণে সাজিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার অজানা আদিম কবি,—"সাত ভাই চম্পা জাগো রে/কেন বোন পারুল ডাকো রে।"

—এ ভাষা নিঃসন্দেহে মনোহর; রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ভাই বোন যে আছে' 'তাদের ভালবাসাও রয়েছে'—তাকে এ ভাষা 'সত্য' করে তোলে; তাহলেও এ-ভাষা অবাস্তব-মনোহর। মানুষের ইতিহাসে ক্রমশ এমন দাবিও উঠল, যা মনোহর, তাই বাস্তবও কেন হবে না, কিংবা বাস্তব প্রয়োজন নির্বাহের ভাষা দিয়েই বাস্তবাতীতকে কেন স্পর্শ করা

যাবে না ; কেন যাবে না সেই ভাষাতেই সহিতত্বের মেলবন্ধন করা ! এই ভাবেই মুখের কথায় ব্যবহৃত গদ্য ক্রমশ সাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ হল।

আর রামমোহনই বাংলা ভাষার প্রথম লেখক, যিনি তাঁর গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণ পাঠকের সঙ্গে 'সহিতত্বের'-'মেলবন্ধনে'র একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এবং উপলব্ধি যে 'সত্য', বহু চিত্তের সমর্থনে প্রতিফলিত করে তবেই তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এইখানেই আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যমে তিনি যথার্থ সাহিত্যিক ; আর এই অর্থে কিশোরীচাঁদের মন্তব্য আন্তরিকভাবে যথার্থ।

কিন্তু মুখের কথা সাহিত্যের ভাষায় ; ব্যাবহারিক ভাষা সহিতত্ব সাধনের মাধ্যমে কি করে পরিণত হতে পারে ? প্রথমেই অনুভব করতে হয়, সাহিত্য শব্দে সৃজনমূলক রচনা তথা রসসংবাদী সাহিত্যের কথাই আমরা মূলত মনে করে থাকি ; এটুকু বাংলা সাহিত্যের সীমিত প্রসারেরই প্রমাণবহ। সাহিত্য, তথা সহিতত্ব-বোধের উদ্ভাস ভাব ও জ্ঞানের উভয় বিষয়কে নিয়েই হতে পারে ; ইংরেজ শিল্পি-সমালোচক 'লিটারেচার অব্ পাওয়ার' এবং 'লিটারেচার অব্ নোলেজ'-এর কথা বলেছিলেন, যদিও শেষোক্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভরে নয়।[৭] অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন,[৮] "যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব ; ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে কল্পনার কাজ কেবল কবিতা সৃজন করা নয়।" বরং রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের এই উক্তি নির্ভর করেই অনুভব করা চলে,—বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা 'অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাবে'র পরিপোষক ; জ্ঞানের সাহিত্য

৭ Cf. De Quincy, T.– Essay on 'Alexander pope' 'Masters' of Literature' Series (Ed. Sidney Low—1911) pp. 153—155.

৮ রবীন্দ্রনাথ—'বাঙ্গালী কবি নয় কেন'। দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় —'রবীন্দ্রজীবনী'—১ম খণ্ড (১৩৬৭) পৃ. ১৩৩।

রসসাহিত্যের ধমনীতে শক্তি ও বল সঞ্চার করে। গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে সকল ভাষাতেই প্রথমাবধি এই ঘটনা ঘটেছে—জ্ঞানের সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে রসের সাহিত্য। বাংলা ভাষায় রামমোহনের দ্বিতীয় কীর্তি—গদ্যেলেখা জ্ঞানের সাহিত্য রচনা করা এবং করানোর উদ্যমে তিনি পথিকৃৎ।

সেই লিখ্য গদ্যের কথাই হচ্ছিল। গদ্যের দুটি রূপ ঃ ব্যাবহারিক আর সাহিত্যিক,—সে জ্ঞানের অথবা রসের সাহিত্য,—যেমনই হোক। প্রথমটির প্রকাশের মাধ্যম মুখের কথা, অপরপক্ষে আধুনিককালে সাহিত্যের ভাষার সাধারণ রূপ লিখিত; এই সূত্রেই আমরা গদ্যের কথ্য এবং লিখ্য চরিত্রের কথা বলে থাকি। কিন্তু ঐ চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গটি এই সূত্রে অবশ্য অনুধাবনীয়। অর্থাৎ যা-কিছু গদ্যে লেখা দেখি সেই সবই কিছু 'লিখ্য' গদ্য নয়। আসলে ভাষা প্রয়োগের মৌল আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য অনুসারে তার রূপগুণগত চরিত্র নির্ণীত হয়ে থাকে। নিত্য প্রয়োজনের তাগিদে যে-ভাষা ব্যবহার করি, কাজ চালানোই তার উদ্দেশ্য; কাজ-ফুরোনোর দিকে তার যত আগ্রহ। একটা ভারি চমকপ্রদ ঘটনা মনে পড়ে,—কথ্যভাষা-প্রকৃতির চমৎকার নিদর্শন! আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে কলকাতার বাজারে প্রথম সওদা করতে গিয়ে দোকানির মুখের কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম—'পআ নেগেলেননা বাবু!'—সেই প্রথম শিখেছিলাম, 'পয়সা' কি করে 'পসা'>'পহা'> 'পআ' হয়ে যায়; আর আমরা সবাই বুঝি, ওপরের কথাটির আসল রূপ হতে পারত 'পয়সা নিয়ে গেলেন না বাবু!'—খুচরো ফিরিয়ে নিতে ভুলেছিলুম আমি প্রথম দিনের অনভ্যস্ত সওদা করতে গিয়ে।

এইভাবে অব্যবহিত প্রয়োজন দ্রুত মিটিয়ে দেবার প্রবণতাবশে মৌখিক ব্যবহারের ভাষা হয় হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত, প্রত্যক্ষতায় তপ্ত। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা প্রসার এবং স্থায়িত্ব কামনা করে; তার জন্যে চাই প্রাঞ্জলতা এবং সৌষ্ঠব। প্রথমটির জন্ম ভাষাপ্রকৃতির সুশৃঙ্খল

প্রযুক্তি-ক্ষমতার সূত্রে; দ্বিতীয়টি যুগপৎ ভাষাবিদ্ ও কলাকারের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপরে নির্ভরশীল। এইখানে এসেই আজন্মকালের পরিচিত মুখের ভাষা লিখতে বসে প্রথম লেখককে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেও এক আপাত অসম্ভবের রহস্য!

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে লেখা 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র'র সন্ধান পেয়েছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে; তার একটি অংশ[৯] "সাং অবন্তিকে—মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা শ্রীমতী মৌনাবতী শোড়ষ বরিস্যা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ম্ন পর্য্যন্ত, যুঙ্গ ভ্রূ ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ম্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল, রূপলাবণ্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা নাঞী....।"

অথচ এর পরেও উনিশ শতকের প্রারম্ভেই—১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরি প্রভৃতিরও বাংলা শিক্ষক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষায় অধ্যাপনারত মুন্সী রামরাম বসু তাঁর 'রাজা প্রত্যাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থে লিখতে পেরেছিলেন,[১০] "ইহাতে সকলেই আনন্দিত ও উল্লাস বাদ্য নৌবৎখানায় ঘণ্টা ঘরে ঘণ্টা আর ২ জন্ত্রীরা আপনাদের যন্ত্রেতে দিবারাত্রি বাদ্যোদ্দম করিতেছে এবং কাঙ্গাল দুঃখি লোকেরদিগকে পরিতোষক্রমে খাদ্যসামগ্রী তৈল তাম্বুল বস্ত্র পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং পরগণা পরগণা এই মত খয়রাত এক মাস পর্য্যন্ত।"

বাক্যের অন্বয় এখানে শৃঙ্খলা-রহিত, অর্থ জটিলতাবিষ্ট, এবং শব্দপ্রয়োগে সৌষ্ঠব অথবা পরিমিতিবোধের একান্ত অভাব। রামরাম বসুর ইতিহাস-খ্যাত গ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হয়,

---

৯ দ্র. ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' দ্বিতীয় পর্যায় [চতুর্থ সং] পৃ. ৫৮ (উদ্ধৃত)

১০ রামরাম বসু—'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' [বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ সং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩] পৃ. ২১।

পর্তুগীজ পাদ্রী মানাএল্ দ্য আস্সুম্প সাম এ-ভাষা লিখলে আপত্তি ছিল না,—বস্তুত অনেকটা এই রকমই বিশৃঙ্খলাকীর্ণ তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভাষারীতি! কিন্তু রামরাম তো এই ভাষাতেই কথা বলতেন, তবু কেন তাঁর রচনায় গঠনগত এমন বিস্রস্ততা? তার উত্তর আছে 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র'র ভাষাপ্রকৃতিতেই; ঐ ভাষা আসলে মুখের কথাকে লেখার রূপ দিতে চেয়েছে। আমাদের দেশে গল্পরস—বিশেষ করে রূপকথার গল্প ছিল বলিয়ের প্রাণরসে ঘনিষ্ঠ। উদ্ধৃত গল্পাংশ দেখলে বুঝি, কোনো গল্প-বলিয়ে তাঁর মুখের কথাকে লেখার আকারে দূরের শ্রোতার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। বস্তুত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রাজা নরনারায়ণের চিঠিতেও রাজকীয় আপাত-আড়ম্বরের অন্তরালে মুখের ভাষাই লিখিত রূপ ধরেছিল—'লিখ্য' ভাষার চরিত্রও তার আয়ত্ত হয় নি; একথা অন্যত্র বলেছি।[১১] পাদ্রীদের লেখা আদিম গদ্যভাষা সম্পর্কেও একই কথা; ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন[১২] পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল দ্য আস্সুম্প সাম কিংবা দোম এন্তোনিও-র লিখিত গদ্য ঢাকা জেলার 'ভূষণা' অঞ্চলের মৌখিক ভাষার কাঠামোর ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

আসলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের অবচেতনাতেই লিখ্য ভাষা গড়ে তোলার সমস্যাটি প্রথম আভাসিত হয়েছিল; কিন্তু তাতে 'সহিতত্ববোধ' বা আন্তর 'মেল বন্ধনে'র কোনো সচেতন আগ্রহ লেখকদের মধ্যে স্পষ্টত উপস্থিত ছিল না। উইলিয়ম কেরি 'কথোপকথন'-এর ভূমিকায় সংস্কৃত-দুহিতা বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

---

১১ দ্র. ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও রামমোহন': 'রামমোহন: নবযুগের নেতা' [টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট গ্রন্থমালা] পৃ. ৮২-৮৪।

১২ দ্র. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন (সঃ) 'পাদ্রি মানোএল্-দ্য আস্সুম্প্-সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রবেশক—পৃ. ১।

সম্ভাবনা নিয়ে যতই ভরসা করে থাকুন, রামরাম, কিংবা এমন কি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও, আসলে সন্ধান করেছিলেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পরভাষাভাষী বিদেশীর কাছে এই ভাষার ব্যাবহারিক বোধ গড়ে তোলার যথাযোগ্য কুশলতাটুকু। স্বভাবতই ভাষার প্রয়োগে পারিপাট্য এবং শৃঙ্খলার কথা তাঁদের চিন্তা করতে হয়েছে, লিখ্য গদ্যের যা মৌল প্রেরণা। কিন্তু এই সূত্রে উদ্দেশ্যের উপযোগী ফললাভই কেবল ঘটেছিল, পাঠ্যপুস্তকের গদ্য ভাষার সন্ধান ও আবিষ্কারেই তাঁদের সকল প্রয়াস সীমিত থেকেছে। রামরামের প্রাথমিক বিস্রস্ততা তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'তে (১৮০২) অনেকটা শুধরে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল; তার মূলে লেখকের ভাষা-চেতনার পরিণতি অপেক্ষা ঐ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের প্রভাব বেশি ছিল বলে মনে হয়। আসলে 'লিপিমালা' পত্ররচনার আদর্শ পুস্তক রূপে কল্পিত; এবং তাতে 'লিখ্য' ভাষাদর্শের চেয়ে ব্যাবহারিক ভাষারীতি প্রয়োগের অবকাশ ঘনিষ্ঠতর ছিল; ভাষার আপাত-সাবলীলতায় তারই পরিচয় স্বচ্ছ।[১৩]—"নিজাধিকারে বক্রেপুর পরগনা তোমার অধিকারের সান্নিধ্য (।) চিরকালাবধি এইমত কখন ২ সীমা সেতুর বাদ বিসম্বাদ হইয়া আসিতেছে (।) এবার তোমার প্রস্থ লোকেরা নিজাধিকারের প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করে।"

ছোট ছোট বাক্য, আর ঋজু সংক্ষিপ্ত বাচনিক প্রয়োগরীতিই এখানে আপেক্ষিক সারল্যের উৎস। বস্তুত মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতির সাফল্যের মাত্রা গুরুতর হলেও চরিত্র অভিন্ন। 'বত্রিশ সিংহাসনে'র (১৮০২) ভাষায় গল্প-বলিয়ের ঢঙ; তাই সে ভাষা সাবলীল; কিন্তু 'হিতোপদেশ'-এ (১৮০৫) সংস্কৃত শ্লোকের সমুচিত অনুবাদ-প্রকরণ খুঁজতে ভাষা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল[১৪]—"প্রাজ্ঞলোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক।

১৩ রামরাম বসু—'লিপিমালা'
১৪ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—'হিতোপদেশ'

আর যমকর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের মত হইয়া ধর্মাচরণ করিবেক। আর সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেহেতু বিদ্যার সর্বকালে চৌরাদি দ্বারা অহরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব।”

অপরাপরের মধ্যে ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’র বিচিত্র-চরিত্র ভাষারীতির সম্পর্কেও একই কথা; চাষী সমাজের চলিত ঢঙের কথোপকথন থেকে আরম্ভ করে কেবল এমন সব ক্ষেত্রেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা সরস সাবলীল, তথা বহুলাংশে বিশুদ্ধ, যেখানে তার আদল ব্যাবহারিক গদ্যের মত। লিখ্য গদ্যের সাহিত্যিক চরিত্রের স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে রামমোহনই প্রথম ভাষা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন; এদিক থেকে বাংলা ভাষায় তাঁর লেখনী চালনার মূল প্রেরণাই ছিল সচেতনভাবে ‘সাহিত্যিক’,—এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

আমরা জানি, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা বই ‘বেদান্তগ্রন্থ’ লিখতে গিয়ে রামমোহন তার অনুষ্ঠান-রীতির বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছিলেন,[১৫]—“প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে।.... অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন, এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।”

রচনাংশটি অতি পরিচিত; তাহলেও কেবল উদ্ধৃত শেষ বাক্যের প্রসঙ্গে পড়লে তবেই প্রথম বাক্যটির সঠিক তাৎপর্য বোঝা যেতে পারে; না হলে রামমোহনের এ মন্তব্য আত্মাদরজনিত অতিশয়োক্তি বলেও মনে হতে বাধা নেই। ‘বেদান্তগ্রন্থে’র ‘অনুষ্ঠান’ প্রকাশিত হবার দু’বছর আগে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ উইলিয়ম কেরি সম্পাদিত ‘ইতিহাসমালা’

১৫ রামমোহন রায়—‘বেদান্তগ্রন্থ’—‘অনুষ্ঠান’, রামমোহন রচনাবলী (পূর্বোক্ত) পৃ. ৭।

প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল ; ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য ভাষাগ্রন্থই তখন প্রকাশিত ; সে-সবের পরিচয়ও রামমোহনের অবিদিত থাকবার কথা নয়। অথচ তার দু'বছর পরে ১৮১৫-তেও বাংলা গদ্যে 'আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের উপযোগী' শব্দগুলি ছাড়া তিনি আর কোনো ভাষা-সম্পদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন নি। আসলে এ-মন্তব্য অভিধার্থে নয়, লাক্ষণিকার্থেই কেবল গ্রহণীয়। বস্তুত ব্যাবহারিক প্রয়োজন ভিন্ন অন্যতম প্রসঙ্গেও লিখিত গদ্য ভাষার প্রচলন যে রামমোহন-পূর্বকালেও ছিল, সেকথা 'অনুষ্ঠান'-অংশের দ্বিতীয় বাক্যেও স্বীকৃত আছে ;[১৬]— "এ ভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয়ে তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে।" প্রমথ চৌধুরীর পরিণত সিদ্ধান্ত এই সূত্রে মনে পড়ে যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র তৎসমবহুল ভাষারীতির প্রসঙ্গে বলেছিলেন,[১৭] "ফলত এ-সকল তর্কালঙ্কার (?) মহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত ও বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার (?) মহাশয় এই কিম্ভূত কিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

রামমোহনের কথাতেও এই তথ্যেরই ইঙ্গিত। বাংলা গদ্যের তখন দু'রকম লিখিত রূপ গড়ে উঠেছিল—এবং তা বহুলাংশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনার চেষ্টাকে আশ্রয় করেই। রামমোহনের মতে তার একটি হল 'আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম',— প্রধানত মুখের ভাষারই লিখিত রূপ ; আর এক, সংস্কৃতজীবী 'কিম্ভূত' ভাষা, যা মোটে বাংলাই নয়। এরই মাঝখানে প্রথম লিখ্য ভাষাকে তিনি জন্ম দিলেন 'বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণ' রচনা করতে বসে। এ ভাষার জন্ম সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষার প্রণোদনামূলে।

১৬ রামমোহন রায়—তদেব পৃ. ৭।
১৭ প্রমথ চৌধুরী—দ্র. 'সবুজপত্র', ফাল্গুন, ১৩২১, পৃ. ৭৮০-৮১।

রামরাম-মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য রচনার প্রেরণা ছিল বহিরাগত। একই লেখক বিভিন্ন বিষয়ের প্রকাশ-মাধ্যম খুঁজতে গিয়ে নানারকম ভাষারীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সন্দেহ নেই ভাষা ভাবেরই বাহন; যে-কোনো বক্তব্যের সুষ্ঠুতম প্রকাশ বিধান করতে পারাতেই তার চূড়ান্ত সফলতার নিরিখ। কিন্তু বক্তব্য যখন বক্তার হৃদয়বৃত্তির সহজ অনুমোদনের সূত্রে উৎসারিত হয়, কেবল তখনই সে ভাবাত্মক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে;—তখনই তা সাহিত্যের ভাষা;—রসবাহী অথবা জ্ঞানমূলক—সে যেমন সাহিত্যই হোক্। রবীন্দ্রনাথের কথার অনুসরণে বলা চলে, যে প্রকাশ-চেষ্টার মূলে পাঠকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে লেখকের সত্য হতে এবং সত্যকে পেতে পারার আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে থাকে,—যে রচনার মাধ্যমে পরতর সত্তার সান্নিধ্য কামনায় রচয়িতা কেবলই হয়ে ওঠেন—বিকশিত হতে থাকেন,—সে ভাবানুভব অথবা চিন্তালোক যেখানে যেমন ভাবেই হোক্,—সেই ভাষাই সাহিত্যের ভাষা, সেই রচনাই সাহিত্যের উপাদান। বাংলা গদ্যে সেই ভাষা সেই রচনা রামমোহনের অদ্বিতীয় দান—এতক্ষণ ধরে পারিপার্শ্বিক তথ্যযোগে কেবল এই কথাটিই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি।

'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) থেকে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) পর্যন্ত সকল রচনার মূলেই লোক-প্রবোধন ছিল তাঁর একমাত্র আগ্রহ; কিংবা বিপরীতভাবে বলা চলে, নিজের বিচার এবং উপলব্ধিগত সত্যচেতনাকে সর্বজনীন গ্রহণীয়তার নিকষে যাচাই করেই তিনি সত্য হতে, সত্যকে পেতে চেয়েছিলেন। এই অন্তরনিঃসৃত আকাঙ্ক্ষার সূত্রেই রচনার সঙ্গে রচয়িতার আত্মার সংযোগ, —কর্মের ভেতর দিয়ে কর্মীর আত্মউৎসার। বস্তুত এই স্বতস্ফূর্ত আত্মসম্পৃক্ততাই যে-কোনো প্রচেষ্টাকে ভাবাগর্ভ বা 'ইমোটিভ্' করে তোলে; —তাই মৌলিক সৃজনকলার প্রাণ! রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,[১৮] "আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে, আমার

১৮ রবীন্দ্রনাথ—'গীতাঞ্জলি', রবীন্দ্র রচনাবলী-১১, পৃ. ৭৮।

মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।" উপনিষদও সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার আত্ম-আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রেরণারূপে নির্দেশ করেছেন।[১৯] ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার এই আত্মসমর্পণের আবেগেই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত বিশিষ্ট রীতির স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে, ইংরেজিতে যাকে বলি স্টাইল। অন্যত্র বিস্তারিত-ভাবে বলেছি,[২০] বাংলা গদ্যে এই স্টাইল-এর সূচনা হয়েছিল আপন বলিষ্ঠ বক্তব্যের গভীরে বক্তা রামমোহনের প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপণ-সূত্রে। আর স্টাইল বা রীতি সাহিত্যের আত্মা না হোক্ তার আত্মিক দ্যুতির বাহক।

বাংলা গদ্য ভাষায় লিখ্য চরিত্রের রূপ-সন্নিধানে, তার মূলগত 'সাহিত্য' সাধনের প্রেরণার প্রবর্তনে, তথা রচনার মধ্যে রচয়িতার আত্মসমর্পণ-জনিত নূতন মাত্রা যোজনার অভূতপূর্বতা সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের পথিকৃত্তের ভূমিকা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, একেবারে শুরুতেই বলেছি, সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যরচয়িতার রচনাক্ষেত্রেই তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার ব্যাপকতর প্রসার ঘটেছিল।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে ; রামমোহনের তিরোভাবের সাতাশ বছর পরে 'পদ্মাবতী' নাটকে নূতন পদ্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন তিনি 'বাংলা অমিত্রাক্ষর,'—'তিলোত্তমা সম্ভব,' 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'তে তার ক্রমিক বিস্তার ও পরিণতি। ঈশ্বরগুপ্ত তার বহু পূর্বে অমিত্রাক্ষর নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন,[২১] "কবিতা কমলাকলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"—

১৯ দ্র. বৃহদারণ্যক ॥১॥৪॥৩॥
"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম ॥
স বৈ নৈব রেমে ॥
একাকী ন রমতে ॥
স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ ॥"

২০ দ্র. ভূদেব চৌধুরী—প্রথমোক্ত গ্রন্থ—পৃ. ১৩১—১৩৯।

২১ দ্র. মধুসূদন গ্রন্থাবলী (কাব্য) সাহিত্যপরিষৎ সং—১৩৬৮ (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্রাংশ-উদ্ধৃতি) তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ভূমিকা পৃ. ।৵।

তার রেশ মধুসূদন-সমকালীন বিদগ্ধ বাঙালির সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় নি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে ইংরেজি বিদ্যার প্রসার সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে এক স্বাধীন পরিশীলিত কাব্যরুচিও সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। আর তাই 'তিলোত্তমা সম্ভবে' মধুসূদন যখন কেবল অংশত সফল অমিত্রাক্ষর কাব্যভাষা গড়ে তুলতে পারলেন, তখনই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মত অবিশ্বাসীও তাকে উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতিভরে বরণ করে নিলেন। কাব্যে অমিত্রাক্ষরের ঔচিত্য ও উপযোগিতা, প্রয়োগ-ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা, অথবা প্রসার সম্ভাবনা নিয়ে একদল সংস্কারজীবী যেমন বিরোধিতা করেছেন, তেমনি হেমচন্দ্রের মত কবিও নানা রকম সংশয় শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।[২২] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত স্বভাবশিল্পীও প্রথমে এই ছন্দোরীতির করণ-কৌশল অনুধাবন করতে পারেন নি, আর সেজন্য মধুসূদন ক্রুদ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অমিত্রাক্ষর কবিতাকলার জয়রথ অগ্রসর হয়ে গেছে; 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচিত হতে পারার ফলে তার সর্ব-ব্যাপিতার স্বীকৃতিও আর কুণ্ঠিত থাকে নি। কবিতা সৃষ্টির ক্রমবর্ধনশীল সফলতা ও বলিষ্ঠতার সূত্রে মধুসূদন এক নূতন সাহিত্যরুচিরও জন্মদান করেছিলেন। এটা তাঁর কবিকৃতির এক অতি শ্রেষ্ঠ অথচ পরোক্ষ ফল।

কিন্তু বাঙালির সাহিত্যরুচির সংগঠনে রামমোহনের ভূমিকা ছিল আরো প্রত্যক্ষ,—বস্তুত অনন্য-ও; নিছক তথ্যানুসন্ধানীকেও এ-বিষয়ে অবহিত হতে হবে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যখন 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা করেন, নাগরিক বাঙালি তখন কেবল সাহিত্য-ভাষায় দীন নয়, বস্তুত সে ছিল সাহিত্য-ভাষাহীন! হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার তখনো দু'বছর বাকি। অতএব, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে চাকুরিলোভী চিত্তের

২২ দ্র. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'বৃত্রসংহার'—'প্রথমবারের বিজ্ঞাপন' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—১৩৬৮ সং) পৃ. ৩।

যোগ তখন কেবল শব্দার্থ-জ্ঞানসর্বস্ব; রাজনারায়ণ বসুর সাক্ষ্য অনুসারে[২৩] 'নামতা ঘোষানোর' মত মুখস্থ করিয়ে কয়েক শ' ইংরেজি শব্দের বাংলা মানে শিখিয়ে ওঠা। পূর্ববর্তী রাজভাষা আরবি-ফারসি সম্পর্কেও অধিকাংশেরই অধিকার সুস্থ ভাষা-চেতনার সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে জানা যায় না। আভিজাত্যাভিমানী পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃতের চর্চা যতটুকু হত, তাও উদ্ভাবনী ভাবনা কিংবা মৌলিক চিন্তার সজীব স্পর্শ হারিয়ে কেবলই পাণ্ডুর হয়ে পড়ছিল।[২৪] আর বাংলা গদ্য ভাষায় ভাব বা চিন্তার বিনিময় দূরে থাক, প্রাথমিক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বিষয়জ্ঞান বহনের উপযোগী কাঠামোটিও যে ছিল না, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যম তার অনস্বীকার্য প্রমাণ। শুধু তাই নয়, সেকালের বাংলা পদ্য ভাষাও নাগরিক বাঙালির মন বা মননের 'সাহিত্য'-সাধনের উপযোগী জীবনীশক্তিতে একান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল; কবিওয়ালা থেকে ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য রচনাবলিতে তার দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য। এই সঙ্গে কয়েকটি তারিখের প্রসঙ্গ স্মরণ করে রাখবার মত; ১৮১৮-তে প্রথম সাময়িক ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা গদ্য ভাষায়, 'দিগ্‌দর্শন', 'বাঙাল গেজেটি' এবং 'সমাচার দর্পণ'। অন্যত্র বলেছি,[২৫] বাংলা গদ্য ভাষায় অধিবিদ্যাগত মনন, কিংবা এমন কি, সৃজনশীল অনুভাবনার সাধারণীকরণ অন্তত প্রথম সূচিত হয়েছিল সংবাদ ও সাময়িক পত্রের মাধ্যমে; তার প্রথম সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ঈশ্বরগুপ্ত-সেবিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় চিহ্নিত। সে পত্রিকার জন্ম সাল ১৮৩১; আর ১৮৩০-এর নবেম্বরেই রামমোহন বিলেত চলে গিয়েছিলেন; বাংলা ভাষার সকল চর্চা তাঁর তখনই শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু ১৮১৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত যে ঐকান্তিক প্রয়াসের ফসল দেখি

২৩ দ্র. রাজনারায়ণ বসু—'সেকাল ও একাল' (১৩৫৮) পৃ. ২৪-২৬।

২৪ দ্র. শিবনাথ শাস্ত্রী—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯৫৭) পৃ ৭১-৭২।

২৫ দ্র. ভূদেব চৌধুরী—প্রথমোক্ত গ্রন্থ—পৃ. ১২৯।

১৮৩১-উত্তর 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায়, তার অক্লান্ত একক নিরন্তর সেবক ছিলেন কেবল্ রামমোহন রায়ই। আগে দেখেছি,—নিজের উপলব্ধি-প্রত্যয়কে বিচারসহ গ্রহণীয়তাযোগে আপন সমাজের 'লোক'-সাধারণের কাছে অর্পণ করতে পারার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন; বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে রচয়িতার আত্মসমর্পণের সাহিত্যিক ইতিহাস ঐখান থেকেই শুরু। আর মধুসূদন বা অপর কোনো স্রষ্টার মতই রামমোহনের সহৃদয়-হৃদয় শ্রোতা তো একজনও ছিলেন না। আসলে অপরের কথা শুনে বুঝে গ্রহণ করতে পারা অথবা না পারার মধ্যেই তো সহৃদয়তা কিংবা হৃদয়-বিমুখতার বিচার; সাহিত্য আসলে মানুষের আভ্যন্তর অভিপ্রায় আদান-প্রদানেরই পরিভাষা। কিন্তু সে ভাষা যখন গড়ে ওঠে নি, আকাঙ্ক্ষা যখন আত্মসমর্পণে ব্যাকুল হয়েছে, অথচ তার সমুচিত মাধ্যম অনুপস্থিত, একটি লোকও যেখানে নেই, সে ভাষার বাণীকে যে অনায়াসে অন্তরে গ্রহণ করে নিতে পারে, রামমোহন তখনই অভূতপূর্ব এক মননের ভাষার মৌলিক সৃষ্টিতেই কেবল রত হলেন না, সেই ভাষার বোদ্ধা পাঠক সমাজের সংগঠনেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থে'র 'অনুষ্ঠান' অংশে রামমোহন সর্ব প্রথম 'আলাপের ভাষা' ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা—লিখ্য সাহিত্যসম্ভাবক ভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন; সেই ভাষার পাঠ-প্রকরণ ও অর্থ গ্রহণের পদ্ধতিও নির্দেশ করলেন।

আপাতদৃষ্টিতে এ প্রয়াস ভাষাবিদ্ বৈয়াকরণের; বাংলা ব্যাকরণ-ভাবনার ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক আদর্শ পদ্ধতির পথিকৃৎ রামমোহন। সে কথা পরে আসবে, আপাতত বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের ভূমিকাই আমাদের আলোচ্য। আর সাহিত্যের মুখ্য পরিচয় তার প্রকাশমূল্যে; ভাষা সে প্রকাশের একমাত্র বাহন। রামমোহন বাংলা গদ্য ভাষাকে সেই ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছিলেন,—কেবল একক প্রচেষ্টায় নয় অনিচ্ছুক লেখকসমাজে আকাঙ্ক্ষার জোয়ার টেনে এনে এক সামবায়িক আন্দোলন সৃষ্টি করে।

১৮১৩ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আওতায় প্রকাশিত গদ্য ভাষার প্রকৃতি আগে লক্ষ্য করে এসেছি, কথ্য চরিত্রের লিখিত রূপ-মূর্তিতে সে সাবলীল ; কিন্তু লিখ্য গদ্য গঠনের পরিচ্ছন্ন আকার তখনো সে খুঁজে পায় নি। অন্যপক্ষে 'দিগ্‌দর্শন'-এ ক্রমশ যে-সব গল্পই প্রকাশিত হল, তাতে দেখি 'ইতিহাসমালা'র ভাষার তুলনাতেও সে সাবলীল না হোক, লিখ্য ভাষা-চরিত্রের জটিলতা-জড়িত, অথচ 'প্রবোধচন্দ্রিকা' কিংবা 'হিতোপদেশে'র তুলনায় এ ভাষা কত অন্বয়-পরিচ্ছন্ন এবং বোধগ্রাহ্য[২৬] —"পরে যখন চিকিৎসক বাদশাহের হাত বান্দিল ও মৃত্যুসূচক অস্ত্র হস্তে করিল তৎকালে ঐ চিকিৎসক ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল, ও যে কর্ম্মের শেষ না দেখ তাহার আরম্ভ করিও না এই উপদেশবাক্য দেখিয়া চমৎকৃত এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্র তাহার হাত হইতে পড়িল...."

এ-রচনা ১৮১৯-এর ; আর ঐ বছরের শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যে রামমোহনের লেখা তেরোখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল ; ১৮১৮ পর্যন্ত লিখিত তাঁর অনুরূপ রচনার সংখ্যা ১০। ১৮১৫-তে প্রকাশিত হয় 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্ত সার' ; এবং তারপরে 'তলবকার উপনিষৎ', ও 'ঈশোপনিষৎ' ১৮১৬-তে ; ১৮১৭-য় 'কঠোপনিষৎ', 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' ; ১৮১৮-তে 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' এবং 'গায়ত্রীর অর্থ'। ১৮১৯, অর্থাৎ 'দিগ্‌দর্শন'-এ পূর্বোক্ত রচনা প্রকাশের বছরে 'মুণ্ডকোপ-নিষৎ' 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' এবং 'আত্মানাত্ম বিবেক' প্রকাশিত হয়েছিল।

এই তালিকার প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, রামমোহনের গদ্য রচনাবলি উদ্দেশ্য ও প্রকরণের বিচারে দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে। কিছু লেখা লেখকের স্বয়ম্ভর ভাবনার অভিব্যক্তি ; আরো কিছু বিতর্ক-

২৬ 'এক বাদশাহ ও ফকীর'—'দিগ্‌দর্শন' ১৮১৯, ফেব্রুয়ারী পৃ ৫০৭-০৮।

মূলক, পরপ্রতিঘাতী। আগে বলেছি, 'বেদান্তগ্রন্থ' 'ব্রহ্মসূত্রে'র সমূল বঙ্গানুবাদ—ব্যাসের বাণী এবং শঙ্করাচার্যের ভাষ্য সমেত। কিন্তু তাহলেও রামমোহনের রচনা কেবল পরাশ্রয়ী নয়, পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা অনুসরণ করে নিজের উপলব্ধিজাত প্রত্যয়কেই তিনি যুক্তিসহ রূপ দিয়েছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ-বিষয়ে স্মরণীয়,[২৭]—বেদান্তের অদ্বৈতবাদী শাঙ্কর ভাষ্যের ভারতব্যাপী প্রসার সত্ত্বেও,"....বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী বলে কোনো সম্প্রদায় বা সমাজ গড়ে ওঠে নি হিন্দুদের মধ্যে। এর কারণ, শঙ্করাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী এবং তিনি নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্রষ্টা।....অদ্বৈতবাদের অবচ্ছিন্ন তত্ত্বদর্শনশাস্ত্রের পুঁথির পাতার মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেল—মানুষের জীবনপ্রবাহে বা সমাজ-সংসারের ব্যাবহারিকতায় তারা রূপ পরিগ্রহ করতে পারলে না; রামমোহন শঙ্কর-শিষ্য ও অদ্বৈতবাদী হয়েও সংসারবিমুখ হলেন না এইটিই হল নবমতের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন জানতেন অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম নির্গুণ; সেই নির্গুণ নিরাকার নির্বিকল্প ব্রহ্ম নেতিধর্মী, অর্থাৎ ব্রহ্মকে নেতি নেতি অসংখ্যবার বলেও তাঁকে ইতিবাচক করা যায় না। সুতরাং তাঁকে সগুণরূপে উপাসনা করতে হবে। তবে সগুণ ও সাকার প্রতিশব্দ-বাচক নয়।"

রামমোহনের ধর্মচেতনা ও দর্শনভাবনা এ আলোচনার প্রসঙ্গভুক্ত নয়; সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞানও। তবু ইতিহাসের পক্ষেও এই ইঙ্গিতটি বিচার করে দেখবার মত,—সত্যিই রামমোহন ধর্মসাধনাকে কর্মসাধনার প্রেরণা স্বরূপ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন; সন্ন্যাসীর দর্শনকে সংসারীর জীবনযাত্রার দেহলিতে আহ্বান করে এনেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি এবং অধিগত সাফল্যের পরিমাণ হিসাব করে দেখার যোগ্য।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য ছিল, কিছুসংখ্যক স্বয়ম্ভর রচনার মাধ্যমে

---

২৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' পৃ. ২১১।

রামমোহন তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ও প্রত্যয়কেই শাস্ত্রানুশাসনের অনুসারে যুক্তিসমর্থিত প্রতিষ্ঠা দান করতে চেয়েছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' কিংবা পূর্বোক্ত পঞ্চোপনিষৎ এদিক থেকে কেবল ভাষাদিসহ সংস্কৃত মূলের অনুবাদ মাত্র নয়,উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে তাতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিও অভিব্যক্ত হয়েছে। 'গায়ত্রীর অর্থ'র মত রচনায় তার আরো স্বচ্ছ প্রকাশ। এইরূপ গ্রন্থাবলির ভাষা বাংলা গদ্যে জ্ঞানমূলক সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের একটি দৃঢ় রীতিবদ্ধ ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বাংলা গদ্যের 'গ্রানিট স্তর'[২৮] বলে উল্লেখ করেছিলেন; এটুকু ইতিহাসের তথ্য, কবি-কল্পনা নয় একেবারেই। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করতে হয়, এমন কি সজনীকান্ত দাসও নির্মোহ মূল্যায়নে রামমোহনকে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রাবন্ধিক রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[২৯] বাংলা গদ্যসাহিত্যের নির্মাতারূপে এইখানে তাঁর অবিতর্কিতব্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

কিন্তু এছাড়াও বাংলা গদ্যসাহিত্যের অভ্যুদয়ে রামমোহনের বিতর্কমূলক অথবা বিতর্কধর্মী রচনাগুচ্ছের ভূমিকা ছিল ব্যাপকতর। পূবোক্ত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', সহমরণ বিষয় 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' এবং 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রামমোহন তাঁর সংস্কারমুক্ত বিচারশীল মনোভাবনার সহযোগে শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন সংগ্রহ করে চলমান সামাজিক জীবনের জন্য নূতন প্রেরণা ও আদর্শ গড়ে তোলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন; প্রথাবদ্ধ নির্বিচার সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা তাতে বিচলিত হল। ইতিহাসের যুগান্তর লগ্নে চিরকালই এমনটি ঘটে থাকে, স্থিতাবস্থার নিশ্চয়তাবিলাসী অলস জড়তা পরিবর্তনের আলোড়নে কম্পিত হয়ে ওঠে; তার প্রতিরোধে সর্বস্ব পণ করে। বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। আগে দেখেছি, আমাদের জাগৃতিপ্রয়াস ধর্ম ও সামাজিক প্রযুক্তির পথ ধরে এগিয়েছিল।

২৮ দ্র. রবীন্দ্রনাথ—'আধুনিক সাহিত্য'—রবীন্দ্র রচনাবলী ৯, পৃ. ৪০১।
২৯ দ্র. সজনীকান্ত দাস—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' পৃ. ৩১০।

রামমোহন আসলে ছিলেন সেই পথেরই কর্মযোগী পথিক। কিন্তু তাঁর কর্মযজ্ঞেরও প্রধান হাতিয়ার ছিল বাহু নয়, মস্তিষ্ক। নূতন কর্মপথে প্রর্বতনার প্রথম এবং প্রধান পাথেয় তাঁর চোখে ছিল প্রত্যয়ের নবীকরণ, —যা কেবল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিত্তবৃত্তির আমূল পরিবর্তনেই সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যেই কর্মযোগী লেখনীর সাহায্য নিয়েছিলেন ; এই অর্থেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের অনুপ্রবেশ পরোক্ষ সূত্রে। কিন্তু তরবারির চেয়ে লেখনী অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবলতর অস্ত্র হয়ে দেখা দেয়। রামমোহনের প্রবল ব্যক্তিত্বের জোর নবজাত বাংলাগদ্যের অপুষ্ট শরীরে দৃঢ় ঋজু এক রীতিশক্তির জোয়ার এনে দিলে ; যুক্তির অকাট্যতা ও প্রমাণের প্রতিষ্ঠা অমোঘ বলে ঘোষিত হল। তারই ফলে প্রতিপক্ষকে জড়তা কাটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হতে হল,—প্রতি-অস্ত্রকেও হতেই হল ভাষাশ্রয়ী। কথা দিয়ে কথা কাটবার খেলা লেগে গেল ; আর কথার জোরেই তো হারজিতের নিরিখ !

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বেদান্তবিষয়ক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি লিখলেন 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর সব-কখানা গ্রন্থের রচনা তখন শেষ হয়ে গেছে ; এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উজ্জ্বলতম ফসল 'ইতিহাসমালা'ও। তাহলেও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় তিনি লিখলেন[৩০] "ঐরূপে সূত্রাদি পঞ্চক পরম্পরার কর্ম্মবিষয়ক তাৎপর্য্যার্থ এই অকৃতসন্ন্যাস ব্রাহ্মণ বিবিদিষু বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ই বা তাদৃশ ভিক্ষাচর্য্যানধিকারি ক্ষত্রিয়াদি গীতাতে ভগবদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগেতেই দেহপাত পর্য্যন্ত থাকিবেন [।] অতএব যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও ষড়দর্শন -টীকাকর্ত্তা বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্মণ ও জনক রাজা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সমকালে সন্ন্যাসাকরণ গীতোক্ত কর্ম্মযোগা-চরণেতেই নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিভাগী হইয়াছেন [।]"

৩০ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার—'বেদান্তচন্দ্রিকা' [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঃ)—(দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থমালা—৪)] পৃ. ৫।

এখানে স্মরণ করতেই হয়, বর্তমান আলোচনা ভাষার গঠন সম্পর্কিত নয়, ভাষার 'সাহিত্য'-বাহিতার গুণাগুণ সম্পর্কিত। বলা বাহুল্য, সহিতত্ববোধ সঞ্চারের সার্থক বাহন হিসেবে ভাষাকে নির্ভুল এবং যথোচিত সৌষ্ঠবযুক্ত হতেই হয়। আর একেবারে প্রথম স্তরে কেবল ঐটুকু আয়ত্ত করতেই কত অক্লান্ত শ্রম আর সাধনা প্রয়োজন হয়েছিল! সেই বিস্ময়কর ঐতিহাসিক প্রয়াসের ব্যাপক পরিচয় অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেছেন ডক্টর শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'Bengali Prose: Carey to Vidyasagar' নামক গ্রন্থে। তাছাড়া ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' কিংবা অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর লেখা 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' গ্রন্থের ভূমিকা এবং অপরাপর আরো বহু রচনার পরিচয় এ-বিষয়ে সুবিদিত। বাংলা লিখ্য গদ্যরীতির প্রাথমিক সংগঠনে রামমোহনের অন্যতম পথিকৃৎ-এর ভূমিকা সকল আলোচনাতেই স্বীকৃত এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু সেই আদি গঠমানতার যুগেই যেখানে তিনি অনন্য—সাহিত্যিক ভাষার নির্মিতি সাধন এবং নির্মিত বিধানে—তারই কথা বলতে বসেছি আমরা। আর সেই সূত্রে এরই মধ্যে দেখে এসেছি, যুক্তিবিদ্ মনস্বী রামমোহন রচনার মধ্যে আপন রচয়িতৃ সত্তার প্রত্যয়কে সমর্পণ করে পাঠকের সঙ্গে আন্তরিক মেল বন্ধনের উপযোগী স্বকীয়তাদীপ্ত রীতি,—অভূতপূর্ব এক 'স্টাইল' গড়ে তুলেছিলেন। ঐটুকু তাঁর 'সাহিত্য'-সাধনের কথা।

এবারে তাঁর বিধাতার ভূমিকাটির আলোচনাই হচ্ছিল। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র লেখক রামমোহনের প্রথম দুটি বেদান্ত আলোচনা গ্রন্থ পড়ে প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; শেষোক্ত দুটি গ্রন্থের প্রকাশকাল, আগেও দেখেছি, ১৮১৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় এবং রামমোহন তার উত্তরও দিয়েছিলেন ঐ একই ভাষাতে। কিন্তু সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিচার-বিতর্কের ভাষা। রামমোহনের মূল বাংলা রচনা তো স্বভাবত বিতর্ক-প্রয়াসী ছিল না,—লোকপ্রবোধন, আপন উপলব্ধির

সঙ্গে বহুচিত্তের সাযুজ্য সাধন ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। অতএব প্রতিবাদী পক্ষকেও হাতিয়ার শানাতে হল রামমোহন-রচিত সংবেদনের মূলে আঘাত করতে পারার উপযোগী করে। মনে করতে বাধা নেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রেরণাবশেই রক্ষণশীল সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও বাংলা ভাষায় প্রতিবাদের লেখনী ধারণ করেছিলেন; তা না হলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শাস্ত্রালোচনার জন্য বাংলা গদ্যের দ্বারস্থ কখনোই হতেন না।

রামমোহনের মৌলিক উদ্যম প্রতিপক্ষ শিবিরে বাংলা ভাষায় মননশীল বিষয়ে গদ্য রচনার এই অনিবার্যতাবোধ সঞ্চার করেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর আত্মপ্রকাশের পদ্ধতি ও প্রকরণ পরবর্তী লেখকদের গদ্য লেখার চরিত্রকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছিল;—তারই ফলে বাংলা 'সাহিত্যিক' গদ্যের জন্ম—এবং তার ব্যাপক প্রসার। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'তে মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকা ছিল সংস্কৃত তার্কিক পণ্ডিতের: যুক্তিজাল বিস্তার করে এবং প্রতিপক্ষকে আক্রমণ কিংবা ব্যক্তিগত তিরস্কার করে তিনি যুদ্ধ জয় করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন কিন্তু সে পথ দিয়েই গেলেন না। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নিবন্ধের ভূমিকায় উৎসাহভরে তিনি লিখলেন,[৩১] "....মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্বসাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না [।]" কিন্তু একই সঙ্গে খেদ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন,[৩২] "....সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির

৩১ রামমোহন রায়—'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'—রামমোহন রচনাবলী (পূর্বোক্ত)—পৃ. ১০৭।

৩২ তদেব।

বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন [।] কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় [।]অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।"

ভাষালেখক রামমোহনের উদ্দেশ্যটি এখানে দ্ব্যর্থহীন,—রচয়িতার উপলব্ধি এবং প্রত্যয়ের সর্বসাধারণীকরণ। মৃত্যুঞ্জয় সেই মৌলিক দায়িত্ব স্বীকার করেন নি বলে আক্ষেপ করেছেন তিনি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেন নি; স্বয়ম্ভুর একাগ্র সাধনার বলে প্রতিপক্ষের জন্য নূতন বাধ্যবাধকতা গড়ে তুলেছেন অনায়াসে,—হয়ত অবচেতনভাবেই। বিরোধী বক্তব্যের প্রত্যুত্তর রচনায় অক্লান্তকর্মা ছিলেন রামমোহন।

ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত সকল ভাষাতেই তাঁর লেখনী ছিল সদাসচল। বাংলা লেখায় সকল অবান্তর অংশের প্রতি তীক্ষ্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত তর্জনী-নির্দেশ করে আসলে তিনি যুক্তি-বিচার ও প্রামাণ্যের সুকল্পিত অবতারণার সূত্রে অপর পক্ষের মূল প্রতিপাদ্যের অসারতা নির্দেশ করে আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন—প্রাঞ্জল, বিশ্বাসযোগ্য ভাষারীতির দৃঢ় বলিষ্ঠ বন্ধনে। এসব ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রকাশরীতি, ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের উদার আদর্শকে অনুসরণ করেছিল প্রথম থেকেই। প্রথমে পূর্বপক্ষের সকল বক্তব্য ও যুক্তি-সিদ্ধান্ত নিঃশেষে বিবৃত করে তারপরে নিজের যুক্তিজাল বিস্তারক্রমে প্রতিটি বিরুদ্ধ মতকে সংশয়াতীত পরিচ্ছন্নতায় খণ্ডন করতে চেয়েছেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' বা 'বেদান্তসার'-এও অল্পবিস্তর এই আদর্শ অনুসৃত হয়েছে, 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'-এর প্রশ্নোত্তর-বাহিত বিতর্কমূলক ভঙ্গিতে অনুরূপ রামমোহনীয় রচনাদর্শের উজ্জ্বলতম প্রতিষ্ঠা। এই কল্পিত তর্কযুদ্ধের প্রকরণ আরো শাণিত হয়েছে যথার্থ প্রতিপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে। রামমোহনের বাচনভঙ্গির যুক্তি-গ্রাহ্য অকাট্যতা ও প্রামাণ্যনির্ভর

স্পষ্টতা 'সর্ব্বসাধারণ' 'লোকের' প্রত্যয়কে আকর্ষণ করতে চাইছিল সবলে; তার প্রতিষেধার্থ অগত্যা প্রতিপক্ষকে ক্রমশ তাঁদের বাংলা রচনায় সর্বসাধারণাভিমুখী প্রবণতাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। লিখ্যভাষার ইতিহাসে এই লোকাভিমুখিতার আগ্রহ ও আকাক্ষা রামমোহনের শ্রেষ্ঠ একক সাহিত্য-কীর্তি বলে বিশ্বাস করি।

সৌভাগ্য বশে এই উদ্যম সূচনার অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু কলেজ, হেয়ার স্কুল, রামমোহনের অ্যাংলোহিন্দু বিদ্যালয় বাঙালি তরুণ সমাজে যুক্তিমুখীনতার এক অনুকূল সর্বায়ত আবহাওয়া গড়ে তুলেছিল। তারই বিকাশপথে রামমোহন আপন প্রগতিশীল মানসিকতার পাল তুলে ধরেছিলেন; সেই জয়যাত্রায় কম্পিত-চিত্ত প্রতিবাদীরা নিজেদের ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় পাল দিয়ে উল্টো স্রোত বেয়ে এগিয়ে আসতে চাইলেন। লেগে গেল গতির প্রতিযোগিতা; তার স্রোত বইল সাময়িক-সংবাদপত্রের খাতে। রামমোহনের ভূমিকা ছিল নাবিকশ্রেষ্ঠের; প্রথম থেকেই যুক্তি-সমর্থিত সত্যের পথ তিনি আপন চেষ্টায় প্রসারিত করে দিয়েছেন। 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠাতে সেই সূত্রে তাঁর প্রথম প্রবক্তার ভূমিকা। বাধাহত হয়ে নিজেই গড়ে তুললেন 'ব্রাহ্মণসেবধি', এবং পরে 'সম্বাদকৌমুদী'। তাঁরই প্রতিবাদে জন্ম নিল নূতন রক্ষণশীল পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'। একদিকে 'দর্পণ' আর একদিকে 'চন্দ্রিকা', মাঝে দাঁড়িয়ে রামমোহন। সেটা বড় কথা নয়। সেকালের পত্রপত্রিকায় সংবাদ ও অধিবিদ্যাগত পাঠ্যাংশ ছাড়া একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল রামমোহন-বরণ কিংবা রামমোহন-বিরোধের নিরন্তর উদ্যম। আর সকল ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠপোষক এবং প্রতিবাদীর সক্রিয়তম ভূমিকায় তিনি গোটা আন্দোলনটির সঙ্গে অচ্ছিন্ন নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তারই ক্রমান্বিত ধারাসূত্রে 'সংবাদপ্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বিবিধার্থসংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ'র পৃষ্ঠায় বাংলা জ্ঞানমূলক সাহিত্যের প্রসার ঘটেছে,—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম 'বঙ্গদর্শন-পত্রিকা'য় বাংলা সৃজনমূলক গদ্য সাহিত্যের উদ্বেলিত উৎসার।

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে,[৩৩]—"মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টি ব্যাপার,……অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। ……দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল'চায়, এবং মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।"

নবজাগরণের বাংলা সাহিত্যে—প্রথমত গদ্যভিত্তিক সাহিত্যে—মিল 'পাওয়া এবং চাওয়া'র সচেতন আকাঙ্ক্ষা—'মেলবন্ধনে'র মৌল প্রেরণা রামমোহনের ব্যক্তিপ্রাণের স্বাধীন রচনা।

এই অখণ্ডনীয় তথ্যটি স্মরণে রেখে আমরা পরবর্তী আলোচনার মুখোমুখি হব। আমাদের পরবর্তী আলোচ্য 'নবজাগরণের বাংলা সাহিত্য ও রামমোহন!'

---

৩৩ রবীন্দ্রনাথ—'মানুষের ধর্ম'—রবীন্দ্র রচনাবলী ২০, পৃ. ৩৭৩।

৩

নবজাগরণের বাংলা সাহিত্য ও রামমোহন

সাহিত্য আসলে সামাজিক মানুষের আত্মবিনিময়ের পরিভাষা। আর জন্মসূত্রে সাহিত্য জীবনসম্ভব—স্বভাবত জীবনের সম্পূরকও। শোকার্তা ক্রৌঞ্চবধূর বেদনা আদিকবির চিত্তলোকে যে অনির্বচনীয় মন্থন সূচিত করেছিল, তাকে সহৃদয় হৃদয়ের সঙ্গে ভাগ করে নেবার অবচেতন আগ্রহ বশেই শ্লোকের জন্ম। আর সেই নবজাত শ্লোকের বাঁধুনি সূত্রে বিশ্বমনকে স্পর্শ করবার ব্যাপকতর আকাঙ্ক্ষা হতে রামায়ণ-সাহিত্যের উদ্ভব। এ-সব গল্প নিঃসন্দেহে প্রতীকধর্মী, কিন্তু তা সাহিত্য-স্বরূপের উপলব্ধিরই প্রতীক।

অন্যপক্ষে জীবনের নিভৃত বেদনানুভবের বৃন্তেই বাল্মীকির প্রথম শ্লোক জন্মলাভ করেছিল; কিংবা এমন অভিমতও দুর্লভ নয় যে, আর্যেতর দক্ষিণী শক্তির কাছে উত্তরভারতব্যাপী আর্য ঔপনিবেশিকতার চূড়ান্ত বিপর্যয়-লগ্নেই উজ্জীবনী প্রেরণারূপ রামায়ণের উদ্ভব। অধুনা সেই পুরাতন কাহিনীর দেশকাল নিয়ে নূতন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। তবু অপেক্ষাকৃত সুপরিজ্ঞাত তথ্যের জগতে পৌঁছে গেলেও একই অনুভব স্পষ্টতর হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) যে সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক বিক্ষেপেরই উৎস-জাত সেকথা, অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১] আর ১৮৭৬[২] এবং তদুত্তর আলোড়ন-উৎক্ষেপের

১ দ্র. ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', দ্বিতীয় পর্যায় (চতুর্থ সং) পৃ. A83—A87.

২ ঐ বছরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতসভার প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ বছরে শিবনাথ শাস্ত্রীর গৃহে বলিষ্ঠ তারুণ্যের সরকারী চাকরিবিমুখ প্রতিজ্ঞাবদ্ধতায় স্বাদেশিকতাবোধ নূতন সংজ্ঞা লাভ করে।

সফল পরিণতি সাধনে পরবর্তীকালে (১৯০৫—১১) 'আনন্দমঠ' যে অমোঘ প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তাতেই সাহিত্য-শিল্পের জীবন-সম্পূরক ভূমিকাটি সুস্পষ্ট। কিংবা আজ বিস্ময়কর মনে হবে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেইসব স্বীকৃতি,[৩]—রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট'-এ 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৭) পড়ে শুনিয়েছিলেন, সেদিন কলেজীয় তরুণেরা মনে করেছিলেন, তারও মূলে প্রেরণার উত্তাপ যুগিয়েছিল সেকালের এলগিন-সাহেবি স্বৈরাচারের অতিপীড়ন।

এ-সবই স্থূল পাথুরে নিদর্শন; যেখানে তা এমন সুগোচর নয় সেখানেও সাহিত্যের উদ্ভব জীবনের প্রেরণা-সূত্রেই, জীবনের প্রয়োজন সাধনে। আর জীবনের পরিচয় দেশকালে পরিকীর্ণ,—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বতন্ত্র। 'আনন্দমঠ' এবং 'গান্ধারীর আবেদন'-এর উৎসমূলে অভিন্ন রাজনৈতিক পীড়নের প্রেরণা যত কম-বেশিই থাক, ১৮৮২ এবং ১৮৯৭-এর পরিমণ্ডল, তথা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য এই দুটি সৃষ্টির বাণী ও প্রকরণে স্বাতন্ত্র্য সঞ্চার করেছে নিঃসন্দেহে। দেশকাল ও স্রষ্টার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের চাপে সাহিত্যের চরিত্র এইভাবেই বিবর্তিত-পরিণত হতে থাকে।

তাই ঘটেছিল নবজাগরণের যুগের বাংলা সাহিত্যেও;—প্রায় হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল ভাব বিষয় ও প্রকরণগত সকল দিক থেকেই। ঐ পরিবর্তনের মূল প্রেরণাটি দেশকালের অমোঘ প্রভাবজাত; আর সেই প্রেরণা রামমোহনের অন্তর-ধর্ম থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করেই প্রথমে প্রকট হতে পেরেছিল; কিছুটা তাঁর ব্যক্তিত্বের সহজ সচেতন স্পর্শে, কিছুটা হয়তো বা অবচেতনায়। ইতিহাসের এই তথ্যটুকুই এবারে যথাযথভাবে নিবেদন করতে চাই।

এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক পূর্বসূত্রটিও ত্বরিত নিমেষে দেখে নিতে হয়। বস্তুত রেনেসাঁস-এর কাল হতেই বাংলা সাহিত্যে

৩ দ্র. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবিরশ্মি', পূর্বভাগ (১৩৩৮) পৃ. ৩৮৫।

আধুনিক মর্জির সূচনা। তার আগে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের হিসেবনিকেশ। প্রধানত সে সাহিত্য ছিল গ্রামজীবন-সঞ্জাত, এবং লোক-সাধারণের অভিমুখী ;—অন্তত সপ্তদশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সাধারণ চেহারাটা তাই ছিল। রচয়িতারা অধিকাংশই ছিলেন পরিশীলিতমনা বিদগ্ধ পণ্ডিত, কিন্তু তাঁদের রচনার আবেদন ছিল সাধারণ সামাজিকের অভিমুখী। 'চর্যাপদে'র অনেক কবিই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত-বোধ্য গ্রন্থ লিখেছেন ; কিন্তু তাঁদের 'ভাষা'-কবিতা জন-জীবনের কত নিবিড় অন্তরঙ্গ ! 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর কবি সংস্কৃত-বিশারদ এবং জয়দেব-পদাঙ্কানুসারী ছিলেন। তাহলেও তাঁর কবিতা কেবল গ্রামীণ আন্তরিকতায় নয়, এমন কি রুচি ও প্রকাশের 'গ্রাম্যতা'র জন্যও একালের শহুরে সমাজে বহুল অভিযুক্ত। অন্যপক্ষে তরুণ কবি কৃত্তিবাস 'পণ্ডিত'-এর প্রবল অভিমান-পীড়িত ছিলেন ; তাহলেও 'লোক বুঝাইতে' যখন তিনি 'দেবের সৃজিত' রামায়ণ-কাহিনীর রূপান্তর সাধন করলেন, তখন তা আপামর বাঙালির হৃদয়ের ধন হয়ে উঠল ;—তাকে ভেঙেচুরে গড়ে পিটে আজ আমরা নিজের মত করে নিতে পেরেছি, কবির স্বকীয়তার পরিচয় তার ভেতর থেকে খুঁজে পাওয়াই দায়। মালাধর বসুর 'ভাগবত' অনুবাদের লোক-চরিত্রও অভিন্ন। মঙ্গলকাব্য-বৈষ্ণবকবিতার ইতিহাসও তাই।

একটা কথা এখানে স্পষ্ট করে নিতে হয়। সেযুগের বাংলা সাহিত্য আসলে ছিল সমকালীন বাঙালি জীবন-স্বভাবেরই উত্তাপে নিষিক্ত ; আর সে জীবন ছিল জমিদার থেকে ভিখারি পর্যন্ত ছড়ানো গ্রামীণ সমাজের কাঠামোয় সংহত। বিত্তগত তারতম্য এবং দূরত্ব সত্ত্বেও মূল্য ও রুচিবোধের এক সাধারণ বন্ধনে সেকালের ভূমিনির্ভর সমাজজীবন দৃঢ়পিনদ্ধ। এ-সব কথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৪] সে-ছকটি স্পষ্ট আভাসিত আছে মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গলে'ও।

---

৪ দ্র. ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', প্রথম পর্যায় (চতুর্থ সং) পৃ. ৪৪১-৪৫৩।

ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে সতীত্বের আদর্শ নির্দেশ করতে ফুল্লরা একের পর এক পুরাণকথার উদাহরণ দিয়েছিল। ব্যাধবধূর কণ্ঠে অভিজাত আদর্শের উচ্চারণ সেদিন বিন্দুমাত্র অসঙ্গত বা অসম্ভব ছিল না। ফুল্লরা নিজেই তার উৎস নির্দেশ করেছিল[৫] "শুনেছি পণ্ডিত স্থানে।" এ পণ্ডিত আর কেউ নন, সমাজ-জীবননিষ্ঠ জীবনমগ্ন কবিকুল। সেকালের গ্রাম-প্রধান ভূম্যধিকারীরা জমিজমা দিয়ে কবিদের পরিপোষণ করতেন কাব্যরচনা করার নির্দেশ দিয়ে। কবির রচনা যেদিন সাঙ্গ হত, তখন সারা গ্রামের জনসাধারণ আমন্ত্রিত হয়ে আসর জমিয়ে বসত—গোটা সমাজ একত্র বসে আস্বাদন করত গায়েনের কণ্ঠনিঃসৃত গান। এই-ভাবে সমষ্টি জীবনের ভাববন্ধন পূর্ণবলয়িত হত।

কৃত্তিবাস কিংবা মালাধরের মত কবি আঞ্চলিক কোনো 'রাজা'র নয়, স্বয়ং গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন; তবু এই সর্বায়ত সমাজ-জীবনাভিমুখিতার ঐতিহ্য তাঁদের কবি-সংস্কারকে সদা সঞ্জীবিত করে রেখেছিল। এবং এইখানেই রাজসভাকবি জয়দেব, বিদ্যাপতি কিংবা পরবর্তীকালের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের গোত্রগত তফাৎ। এঁরা তিনজনেই কেবল রাজসভার কবি নন, নগরজীবনের কবি। সে জীবন অনায়াসে যূথবদ্ধ হতে পারে না। গ্রামে ভূমি-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার পরস্পর-নির্ভরশীলতা সামাজিক মনোধর্ম গড়ে তুলত। কিন্তু নাগরিক জীবনের গভীরে ধন-ভিত্তিক ব্যক্তিগত স্বার্থ-বুদ্ধির তাড়না অপ্রতিহিত। রাজার কৃপালাভ, রাজ-পাত্রমিত্রদের সন্তোষবিধানের মাধ্যমে আত্মসংভরণের লোভ যেখানে একমাত্র, বৃহত্তর সমষ্টিজীবনের কল্যাণপ্রসূ বনিয়াদ রচনা তার পৃষ্ঠপটে পড়েই যায়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্রের কাব্য তাই ব্যক্তি-মানুষের ভোগবৃত্তি চরিতার্থতার মাধ্যম; সামাজিক চিত্তের সার্বিক ভাববিনিময়ের ভাষা সেখানে গড়ে উঠ্‌তে পারে নি। জয়দেব এবং বিদ্যাপতি বাংলা

৫ দ্র. 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্র. সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃ. ২৫১।

সাহিত্যের ইতিহাসে আগন্তুক, কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলা সাহিত্যের ব্যক্তিসন্তুষ্ট আত্মবাদী চরিত্রটি প্রকট হল। অনেকটা এই কারণেও অনেকে তাঁকে আধুনিকতার সন্ধি-স্বভাবিত কবি বলে থাকেন।

ষোড়শ শতকের শেষ পাদে (১৫৭৬) মুঘল অধিকার প্রবর্তিত হবার ফলে বাংলাদেশে নাগরিক জীবনের ব্যাপক বিস্তার এবং সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় গ্রামীণ জীবনধারার বিপর্যয় সূচিত হয়। অবশ্য মুঘল শাসন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত প্রায় লেগে গিয়েছিল।[৬] বাংলা সাহিত্যেও প্রায় সম সময়ে তার ক্রমিক প্রকাশ ঘটতে থাকে। অর্থনৈতিক অভ্যুদয়-লুব্ধ ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর এই নূতন জীবনধারায় সমষ্টিবন্ধনের উপযোগী কোনো সাধারণ ভাবাদর্শ বা প্রেরণা সেদিন একেবারেই উপস্থিত ছিল না। লোভ এবং সম্ভোগ যেখানে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, সাহিত্যও তার তল্পিবাহক হয়ে বসে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' নিঃসমাজ নাগরিক জীবনের কাব্য। অন্যপক্ষে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণ স্বীকার করেও মধ্যযুগে সামাজিক জীবনের কাব্য কেমন হতে পারত, তার সার্থক নিদর্শন ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেনের শক্তি-গীতি। প্রথমটি রাজসভার কাব্য,—দ্বিতীয়, বাঙালির সামগ্রিক জীবনের আত্মবিনিময়ের সর্বজনীন মাধ্যম—যথার্থ 'সাহিত্য'।

স্বাতন্ত্র্যের বোধ সেদিন বিচ্ছিন্নতাকে বয়ে এনেছিল। বস্তুত বাঙালি সমাজে মধ্যযুগেও ধনের কিংবা বিদ্যার পার্থক্য ছিল। কিন্তু সমাজ-সংগঠনের সামগ্রিকতা তাতে ব্যাহত হয় নি; মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর নগরনির্মাণ-চিত্র তার সাহিত্য-নির্ভর ঐতিহাসিক দলিল। অন্যপক্ষে আলোচ্য কালের বিচ্ছিন্নতা কেবল শহর-গ্রামের আবস্থানিক বা অর্থনৈতিক দূরত্বসূত্রেই সংবর্ধিত হয় নি, বুদ্ধিজীবী স্বাতন্ত্র্যও জেগে উঠে সমষ্টিগত সাযুজ্যের বনিয়াদ ছিন্নভিন্ন করেছিল। ভারতচন্দ্রের

৬ বিমানবিহারী মজুমদার—'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', পৃ. ৪২৫।

বিরুদ্ধে অনুযোগ করে লাভ নেই; মধ্যযুগে আচণ্ডাল মানবের পরমপোষক বৈষ্ণবভাবনা এবং বৈষ্ণব সাহিত্যেও এই আভিজাত্যবোধ আলোচ্য সময়সীমায় সার্বিক হৃদয়-সংযোগের দুস্তর অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫৩৭—১৬১৬) বৈষ্ণব কবিচূড়ামণি: শেষ-ষোড়শ ও প্রথম সপ্তদশ শতকে রচিত তাঁর পদ-সাহিত্য সম্পর্কে ভক্ত-বিশেষজ্ঞ অসঙ্কোচে বলতে পেরেছেন,[৭] "তিনি কাশীরাম দাস বা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ন্যায় সর্বসাধারণের জন্য কবিতা লেখেন নাই। সংস্কৃত কাব্য, অলঙ্কার ও বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার না থাকিলে তাঁহার পদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না! ....শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দের যুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর শ্রোতা ও পাঠকের অভাব ছিল না।"

কালের অগ্রগতি এই বিচ্ছেদ ও দূরত্বকে বহুলতর করেছে; শহরে-নগরে মানুষের গোষ্ঠিজীবন খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়েছে তার ফলে। অষ্টাদশ শতকের পরার্ধে ইংরেজ শাসনশোষণের আওতায় এই প্রবণতা ক্রম-প্রসারিত হয়েছে। তারই পিঠে এল উনিশ শতক। ক্রমশ সংস্কৃত পণ্ডিতের পাশে নূতন করে জাগল ইংরেজি পাণ্ডিত্যের অভিমান; আর আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বহুগুণিত হয়ে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত রইল না। নিঃসমাজ জীবনের সেই স্বাতন্ত্র্যাভিমান এবং ব্যক্তিক লোভ-লালসার তল্পি বইতে বাংলা সাহিত্যের ওপরে যে দাবি চাপল তারই প্রকাশ সেকালের কবিগান-খেউড়-যাত্রায়। কবিগান আসলে ভারতচন্দ্রীয় ঐতিহ্যের অবক্ষয়িত রূপ। ষোড়শ শতকের মেদিনীপুর আড়রা গ্রামের রাজা রঘুনাথ এবং অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনাগরিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-পরিবেশ, মানসিকতা ও উদ্দেশ্যে যে তফাৎ, তারই দেশকাল-চিহ্নিত শিল্পরূপ মূর্তি ধরেছে যথাক্রমে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে। আর কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্র এবং কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ কিংবা চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণের সভার চরিত্র ছিল অভিন্ন,

৭ রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩, পৃ. ৫২২।

পার্থক্য কেবল পরিমাণ ও পরিধিগত। ততদিনে ভারতচন্দ্রের মত বিদগ্ধ জনেরা বাংলা ভাষার সান্নিধ্য ত্যাগ করেছেন, তাঁদের উত্তরাধিকার বর্তেছে অশিক্ষিতপটু 'কবিয়াল'দের ওপর। ভারতচন্দ্র রাজা ও রাজপারিষদদের তুষ্ট করেছিলেন ; এঁরা এলেন নতুনযুগের রাজা আর তাঁদের মোসাহেবদের খুশি করবার মুজরা নিয়ে।

নিঃসমাজ মানুষের সাহিত্য আত্মবিনিময়ের যোগসূত্রটি হারালে কেমন ভারহীন হয়ে পড়ে, তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন বাংলাভাষায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে —তারই খরতর পরিচয় কবিওয়ালাদের রচনায়।

এই সব মধ্যযুগের বিনষ্টির ইতিহাস। তারই ওপরে ভর করে এল নবজাগরণের বনিয়াদ। আজ যাকে নবজাগরণের সাহিত্য বলি, তা আর আপামর বাঙালির সাহিত্য নেই, যেমন ছিল কৃত্তিবাসের-কাশীরামদাসের রামায়ণ, মহাভারত, কিংবা চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদ আর রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়ার গান। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সকলেই ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নাগরিক বাঙালির কবি-শিল্পী—তাঁদেরই গোষ্ঠিজীবনের অমর অক্ষয় রূপকার। সাধারণ বাঙালির প্রবেশাধিকার সেই পরিশীলিত সূক্ষ্ম শিল্পলোকে অবারিত নয়। এ-নিয়ে অনুযোগেরও অন্ত নেই ; একবার বঙ্কিমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা করেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; আর একবার—আমাদের এই বিশ শতকে—আলোড়ন জেগেছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনাকে ঘিরে।

সে পৃথক্ প্রসঙ্গ। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, 'নবজাগরণ' তথা 'রেনেসাঁস' আসলে সকল দেশেই পরিশীলিত মধ্যবিত্ত মানসিকতারই ফসল ; একেবারে শুরুতেই একথা উল্লেখ করেছি। অতএব নবজাগরণের বাংলা সাহিত্য বলে যাকে বুঝি, জন্মসূত্রে তা প্রধানত কলকাতাবাসী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ ও মানসিকতার পারস্পরিক আত্মবিনিময়ের মাধ্যমরূপে বিকশিত। আর সেই বিকাশের ধ্রুব পথে তাকে প্রথম পরিচালিত করেছিল রামমোহনের সহজে-বুদ্ধিজীবী চেতনার প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা।

রামমোহনের বাংলা গদ্য রচনার কাল ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সীমাবদ্ধ। নবজাগরণ এবং তার উৎস-নিহিত ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাসের সূত্রে হিসেব করলে দেখব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) দু'বছর আগে লিখতে শুরু করে হিন্দু কলেজের প্রথম তের বছরের ফসল তিনি দেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যজীবনে। আর সেকালের নাগরিক মানসিকতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,[৮]—"বাংলা ভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত এবং বাংলা পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন।" তারপরে তো এল ইংরেজি শিক্ষার আভিজাত্য ; তার প্রভাবে "কথায়-বার্তায় পত্রব্যবহারে সাহিত্য-রচনায় ইংরেজি ভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীন্যের লক্ষণ।"

অথচ রামমোহন এঁদের অনেক আগেই ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হয়েছিলেন, এবং সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর অধিকার যে-কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতের চেয়ে কিছু কম ছিল না। এই সব কিছু নিয়েই তিনি সেকালের দৃষ্টিতে অসঙ্গত অসম্ভবের সাধনে নিয়োজিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়[৯], "সেদিন তিনি যে বাংলা ভাষার ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে-ভাষার পূর্বপরিচয় কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহ ভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত।"

এই দুঃসাহসী প্রয়াসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পূর্ণ করে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোবিন্দদাস কবিরাজের কাল থেকেই সংস্কৃত-বিলাসী একদল বাঙালি বুদ্ধিজীবী—তাঁদের সংখ্যা যতই সীমিত হোক্—আপন আপন স্বাতন্ত্র্য-চেতনা নিয়ে সারা দেশে, এমন কি বহির্বাংলাতেও ছড়িয়ে ছিলেন। আর উনিশ শতকের প্রারম্ভকালীন কলকাতাতেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

৮ তদেব পৃ. ৫২২।
৯ তদেব পৃ. ৪৮২।

মনস্বিতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ ছিল না। অতঃপর ইংরেজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে বাংলার নাগরিক মনীষা অবাধ মুক্তির নূতন পরিধি ও পরিবেশ খুঁজে পেল। সেই নবজাগ্রত জীবনের প্রসার কোন্ পথে কিরূপে হবে, বাঙালির ইতিহাস এই জটিল জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছিল সেদিন। ঔপনিবেশিকতা-প্রভাবিত সে জাগরণ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মত পূর্বাপর জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারত, বস্তুত বিদেশী শাসকমণ্ডলী সেই আকাঙ্ক্ষা বশেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার পত্তনে উৎসাহী হয়েছিলেন। আর কিছুদূর অবধি তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু রামমোহন কেবল তাঁর আন্তরিক প্রেরণাশক্তির বশেই ইতিহাসের মোড় সেদিন ফিরিয়ে দিতে লেগেছিলেন। বাংলার মাটিতে ঔপনিবেশিক মানসিকতার নূতন সংযোগসূত্রে যে নবীন আলোড়নের সূচনা ঘটেছিল, প্রধানত নাগরিক সমাজে, তাকে বাংলা ভাষা-বাহিত খাতে প্রবাহিত করে তিনি যথার্থ 'বাঙালি' নবজাগরণের পথ খুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন,[১০] "বাঙালি একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি মমত্ব স্বতই বাঙালির চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয় এমন আর কিছুই না।"

বাঙালির ভাষা—বাঙালির সাহিত্যকে আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষা গর্বিত জাতির অনীহার মধ্য থেকে রামমোহনই প্রথম মমত্বের অঞ্জলি সমর্পণ করেছিলেন, এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় উদ্বোধিত সাধারণ প্রীতির সূত্রে ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির মধ্যে সংস্কৃতি-নির্ভর এক সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। যাত্রা-কবিগান, সংস্কৃত পণ্ডিতি বিচার, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-উচ্ছ্বসিত একটি দুটি ইংরেজি রচনার খণ্ড-

---

১০ রামমোহন রায়—'ব্রাহ্মণ সেবধি'—'রামমোহন রচনাবলী' (হরফ প্রকাশনী) পৃ. ২৪৩।

বিচ্ছিন্নতা পেরিয়ে বিশেষ করে আধুনিক বাঙালির মন এবং মননের আদান-প্রদানের এক অনিবার্য মাধ্যম হয়ে ধীরে ধীরে দেখা দিল বাংলা গদ্য ভাষা—সহিতত্ব-সাধক সাহিত্যের ভাষারূপে। সেই প্রকরণের পরিচয় পূর্ব অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি। এখানে কেবল অনুধাবন করতে হয়, সেদিন রামমোহনের ভাষা-রচনা করা এবং পরোক্ষত তা রচনা করানোর প্রবণতাসূত্রেই নবজাগরণের বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন হল; অর্থাৎ নবজাগরণের বাঙালি মানসিকতা এই পদ্ধতিক্রমেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে আত্মিক আদান-প্রদানের যথার্থ মাধ্যমটি ধীরে ধীরে খুঁজে পেল। প্রসঙ্গত স্মরণ করি, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে 'Captive Lady' প্রকাশ করে ইংরেজি ভাষায় কবি-প্রতিষ্ঠা লাভে উৎসাহী হয়েছিলেন; বাঙালির ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা থেকে নিজেকে তিনি আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। বস্তুত ইংরেজিয়ানার প্রতি কবির এই আবাল্য প্রলোভন ঔপনিবেশিক মানসিকতারই ফসল। ১৮১৫ থেকে নিজের কাল-প্রতিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আধুনিক মানসিকতার সামনে যদি রামমোহন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রচ্ছদপটটি প্রসারিত করে না যেতেন, মধুসূদনের ঘরে ফিরে আসার পথ তাহলে কিভাবে কখন উৎসারিত হত, হত কিনা, সেকথা আজ কে বলবে? তার বদলে আজকের আমেরিকান সাহিত্যের সমচরিত্র আর এক সাহিত্য, সংস্কৃতির সূত্রপাত হতে পারত সেদিনের বাংলাদেশে।

প্রশ্ন উঠবে, মধুসূদন তো কবিতা লিখেছিলেন, রামমোহন ছিলেন জ্ঞানগর্ভ গদ্যের রচয়িতা। সে উত্তর পরে আসবে। কিন্তু আবাল্য বাঙালি ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট, যৌবনাবধি ঈশ্বরগুপ্তের 'সাংবাদ প্রভাকর'-খ্যাত বঙ্কিম ১৮৫৬তে 'ললিতা তথা মানস' কাব্য প্রকাশ করেও ১৮৬৪-তে, 'Rajmohan's Wife লিখতে বসেছিলেন। এ-সবই ইংরেজ ঔপনিবেশিকতা-প্রসূত আত্মিক পরাভববোধের ঐতিহাসিক লক্ষণ। অথচ এক বছরের মধ্যেই ইংরেজি উপন্যাস ফেলে রেখে বঙ্কিম যে বাংলা 'দুর্গেশ নন্দিনী'র জগতে ফিরে এলেন, তার বনিয়াদটি রামমোহনের

সংগ্রামী হাতের রচনা, তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস একথা ভুলবে কি করে?

বাংলা ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে রামমোহন লোকপ্রবোধনের কথা পুনঃপুনঃ বলেছেন সে তথ্য আগেই লক্ষ্য করেছি। বস্তুত তাঁর সকল উদ্যম উদ্দীপনার মূলে নবজাগরণিক সর্বমানবতাবোধের প্রেরণা এক সাধারণ উপাদান ছিল, আর উপনিষদের আত্মচেতনা সেই মানবিক আত্মীয়তার অনুভবকে করেছিল বিশ্বপ্রসারিত। কিন্তু এ-সবকে ছাপিয়ে রামমোহনের সকল কর্মের মুখ্য প্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল স্বদেশীয়,—স্বসমাজভুক্ত স্বজনগণের সর্বাত্মক জাগরণ ও অভ্যুদয়ের অব্যবহিত তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশে। বস্তুত তাঁর বাংলা ভাষা চর্চা ঐ স্বগোষ্ঠিগত মেলবন্ধনের অমোঘ হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ উদ্দেশ্যসূত্রেই বাংলা রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহও ছিল ঐকান্তিক। 'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রিকায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে যে তর্কযুদ্ধের প্রবর্তন হয়েছিল, তারই সূত্রে তৃতীয় সংখ্যা 'সেবধি'-তে রামমোহন লিখেছিলেন[১১],—"ব্রাহ্মণ সেবধির দুইয়ের সংখ্যা যাহা কতক সপ্তাহ হইল ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর ফ্রেণ্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যায় কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রীয় বিচার এতদ্দেশীয়ের উপকারের নিমিত্ত আর আনুষঙ্গিকরূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্যে উভয়পক্ষে হইয়াছে [।] একারণ আমার এই প্রতীক্ষা ছিল যে ফ্রেণ্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থকর্ত্তা কিম্বা অন্য কোন মিসনরি মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাহ্মণসেবধিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাইবেন, তাহাতে কেবল ইংরেজী উত্তর পাইয়া নিরাশ হইলাম" [।]

অন্যত্র লিখেছিলেন, দেখেছি[১২], "সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে

১১ তদেব—'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'—তদেব—পৃ. ১০৭।

১২ রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্য'—রবীন্দ্র রচনাবলী ৮, পৃ. ৩৪৩; বর্তমান আলোচনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত।

বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন” [।]

অতএব এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বাংলা ভাষাকে রামমোহন নবজাগরণ-যুগের নবীন সমাজভাবনাক্ষেত্রে আত্মবিনিময়ের মাধ্যম রূপেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এবারে প্রশ্ন, এঁরা কোন্ ‘সর্বসাধারণ লোক’? কিংবা ‘এতদ্দেশীয়ের গোষ্ঠি’তে কারা ছিলেন রামমোহনের অভীপ্সিত? মধ্যযুগে কৃত্তিবাস পণ্ডিত কিংবা মালাধর বসুও ‘লোক’ বোঝাবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ছেড়ে বাংলা ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের চোখে ‘লোক’ অর্থ ছিল বাংলাদেশের সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সর্বসাধারণ জনতা। রামমোহনকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে হয়ত তিনি ভারতবর্ষীয়, বিশেষ করে বাংলাভাষাভাষী সাধারণের কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অবচেতনায় একমাত্র উদ্দিষ্ট ছিলেন সেকালের নগর,—বিশেষ করে—কলকাতাবাসী উদীয়মান বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ। এই সিদ্ধান্তের অসংশয়িত প্রমাণ তাঁর রচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

“লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ।” —রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি যদি যথার্থ হয়, তার তাৎপর্য হল, রচনার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করবার সময়ে লেখক অবচেতনায় তাঁর অভিপ্রেত পাঠকের কাছেই নিজেকে প্রাঞ্জল করে তুলতে চান; আর সেই প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষার একাগ্রতা বশেই লেখার ভাব, ভাষা, প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা’-কবিতাবলীর সঙ্গে ‘শিশু’ কবিতাগুচ্ছের রস ও আবেদনগত পার্থক্যের এক প্রধান কারণ কবির ঈপ্সিত পাঠককুলের ভাবগুণগত প্রভেদ। কৃত্তিবাস কিংবা মালাধর বসু তাঁদের পাঠকদের অবচেতনাধৃত রূপমূর্তির দিকে তাকিয়েই বর্ণনাধর্মী আবেগ-সমুখ কাহিনী-কাব্য লিখেছিলেন। তেমনি রামমোহন যখন অসংলগ্ন অপরিণত বাংলা গদ্যভাষার মাধ্যমে ব্রহ্মসূত্রের মত দুরূহ বুদ্ধিগ্রাহ্য গ্রন্থের অনুবাদ, এবং সেই সঙ্গে যুক্তি-বিচারধর্মী মনন-মুখ্য ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন,

তখন নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সমজদার রূপে সেকালের শহুরে কবিয়াল কিংবা তাঁদের সমসামর্থ্যযুক্ত গ্রামীণ লোকসাধারণের কথা কল্পনা করতে পারেন নি। আপন যুগোত্তর বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্ভাবনাকে তিনি উদ্বেজিত এবং উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন। এই সমাজের এক কোটিতে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কিংবা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সংস্কৃতজ্ঞানী পণ্ডিত, আর এক কোটিতে ঈশ্বরগুপ্তের মত প্রধানত কেবল বাংলা-জানা বুদ্ধি-প্রখর সহজ প্রতিভা। আর সেইসঙ্গে রামমোহনই আকর্ষণ করে এনেছিলেন ইংরেজিশিক্ষিত নবযুবকসম্প্রদায়কে; রামমোহনের দেশত্যাগের পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাকে (১৮৩১) আশ্রয় করেও তাঁদের অনেকে যূথবদ্ধ হয়েছিলেন।

মোটকথা, রাজনীতি-অর্থনীতিগত কারণে প্রধানত কলকাতা শহরে যে বিচিত্র বিদ্যা-ভাবনা-সামর্থ্যযুক্ত মধ্যবিত্ত সমাজ উনিশ শতকের শুরুতে নীহারিকার মত অস্পষ্ট কম্পমান হয়েছিল, রামমোহনের আত্মার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সচেতন বিচার-নির্ভর বুদ্ধিজীবিতার প্রতি আকৃষ্ট করা; আর তাঁর সাহিত্যিক উদ্যমের উদ্দেশ্য ছিল সেই বুদ্ধিজীবী মানসিকতাকে বাংলাভাষার নবসৃজ্যমান খাত-পথে প্রবাহিত করে দেওয়া। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে রামমোহন বুদ্ধিজীবী আধুনিক বাংলা সাহিত্যভাবনার খনিত্রধারী পথিকৃৎ। নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মননের পরিবাহকরূপে এইভাবে বাংলা ভাষা নবজাগরণের সাহিত্যের যোগ্য বাহন হয়ে উঠল।

রামমোহন স্ব-নির্ভর বুদ্ধিগ্রাহী যে ভাবনাধারার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, পরিণামে তা নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল। তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঈশ্বরগুপ্তের ব্যক্তিত্বে। গুপ্তকবির প্রতিভা অনেকটা অশিক্ষিতপটু ছিল। যথাযথ পরিশীলনের অভাবে তাঁর কোনো মতবাদ স্পষ্ট-পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি। বরং আদর্শের তীব্র স্ববিরোধিতাই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি সতীপ্রথার পরিপন্থী ছিলেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহেরও প্রখর

বিরোধিতা করেছেন। আসলে এসব কিছুর মূলে ছিল যুগসন্ধি-প্রভাবিত দ্বিধা। কিন্তু শিল্পী কখনোই সেকথা স্বীকার করেন নি, বরং প্রতিপদে নিজের বক্তব্যকে যুক্তি-সমুত্থত সমর্থন দিতে চেয়েছেন। বস্তুত তাঁর 'বিধবা-বিবাহ'-এর মত কবিতাও মৌল চারিত্র ও প্রবণতায় রামমোহন-প্রবর্তিত যুক্তিবাদী গদ্য-প্রবন্ধেরই পদ্যবাহিত রূপ।

অন্যপক্ষে ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের বাংলা কবিতা-ভাবনার জন্মও আসলে ঘটেছিল যুক্তিনির্ভর মতবাদের প্রতিষ্ঠা সূত্রেই। মধুসূদন আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ হলেও এই কাব্যধারার প্রথম পথিকৃৎ নিশ্চয়ই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৭) কাব্যের জন্মকথা প্রসঙ্গে রঙ্গলাল নিজে জানিয়েছেন[১৩], বীটন সোসাইটিতে পঠিত (১৮৫২) তাঁর যুক্তিগর্ভ প্রবন্ধের সারবত্তা প্রমাণ করবার জন্য সুহৃদজন তাঁকে কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন, এবং সেই সূত্রেই—গদ্যপ্রবন্ধের প্রামাণ্য নির্দেশ কামনার বশেই তাঁর প্রথম কাব্যরচনা।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ১৮৫২-তে হরচন্দ্র ঘোষ **'Bengali Poetry'** বলে প্রবন্ধ পড়েছিলেন ইংরেজিতে, বক্তব্য ছিল ইংরেজি কাব্য কবিতার প্রতি-তুলনায় বাংলা কবিতার চূড়ান্ত অপকর্ষ প্রমাণ। কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁর সমর্থনে আলোচনা করেন। বাংলা ছেড়ে ইংরেজির প্রতি ঝুঁকবার এই প্রবণতার মধ্যেই ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরাভবকারী সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়েছিল। রঙ্গলাল তার প্রতিবাদ করেন বাংলা ভাষায় 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' লিখে। আর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, 'সংবাদপ্রভাকরে'র ঈশ্বরগুপ্ত থেকে 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভাবী কবি পর্যন্ত সকলের গদ্য রচনাই রামমোহনের গদ্যভাষাকাঠামোর যুক্তিনির্ভর—'র‍্যাশন্যাল'—আদর্শটিকেই অনুসরণ করেছে।

---

১৩ দ্র. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—'পদ্মিনী উপাখ্যান' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—১৩৫৮ সং) পৃ. ১১-১২।

আসল কথা, উনবিংশ শতকের বাংলা কবিতাও যুগপৎ মধ্যবিত্ত বাঙালির মনন ও মনোধর্মের ফসল। রঙ্গলালের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় তার হাতিয়ারচিহ্নটি কেবল স্পষ্টগোচর। আর এই 'ন্যাশন্যাল অ্যাটিচ্যুড্'-এর উদ্ভব ও গঠনের উপযোগী ছত্রাতপটি বিছানো হয়েছিল কেবল রামমোহনের গদ্য রচনার মাধ্যমে নয়—রামমোহন তাঁর বিতর্কগর্ভ বাংলা চর্চার মধ্য দিয়ে যে একটি সামগ্রিক জাতীয় আলোড়ন ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, তারই ফলপরিণামে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নবজাগরণের এক উজ্জীবনী উপাদান রূপে সর্বস্বীকৃত। কিন্তু অমিশ্র-আত্যন্তিক স্বাতন্ত্র্যমনস্কতাই আবার বিচ্ছিন্নতা-বোধের সূচক। 'মানুষের ধর্ম' বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,[১৪] "দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়।"

আসলে মানুষ মনোময় জীব; জৈব স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতার সঙ্গে মানসিক মিল চাওয়া-পাওয়ার সংযোগ-সিদ্ধিতেই মানবিক ইতিহাসের মুক্তি। মানুষের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য কেবল আত্মসংভরণের উপায় নয়, আত্মপ্রত্যয়েরও অনিবার্য বাহন; ঐটুকু মানবিক নবজাগরণের বিজ্ঞানরচিত ভিত্তি। কিন্তু অবল্পিত আত্মবিশ্বাস যদি পারস্পরিক সহযোগিতার—আত্মবিনিময়ের—মানসিক সূত্রটুকু ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তাহলেই মানসিক রসদে দুর্বল ব্যক্তিক প্রবলতা অবদমিত, আক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত ঐ যোগসূত্রটুকুরই নাম ঐতিহ্য; কোনো এক বিশেষ দেশকালবদ্ধ মানবগোষ্ঠী যে বিশেষ প্রবণতা ও পদ্ধতির সূত্রে পারস্পরিক মিল চেয়ে এবং পেয়ে এসেছে তার পূর্বাপর ধারাটিকেই ঐতিহ্য বলি। সে-কোনো স্থিতাবস্থা নয় একেবারেই, কালের অগ্রগতি এবং নব নব দেশ ও পাত্রের সংঘর্ষে প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর চাওয়া-

---

১৪ রবীন্দ্রনাথ—'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী ২০, পৃ. ৩৭৩।

পাওয়ার প্রবৃত্তিও বিবর্তিত হয়েই চলে। ঐতিহ্য কেবল সেই প্রবহমান জীবনধারার পূর্বাপর সংযোজক পথ-রেখাটি।

সেই যোগসূত্রটি হারিয়ে আমাদের কালের পৃথিবী আজ বিচ্ছিন্নতা-বোধের আক্ষেপে জর্জরিত। অথবা নবজাগরণের যুগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্যপ্রখরতা যে পথভ্রষ্ট হতে পারে নি, তারও মূলে রয়েছে রামমোহনের প্রবর্তনার প্রভাব। বস্তুত উন্মার্গগামিতা সেদিনও দুর্নিবার হতে চলেছিল। বলিষ্ঠ 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অতিচারী আত্মবিমুখতা এবং অক্ষম 'বাবু' সম্প্রদায়ের যথেচ্ছাচারী আত্মবিলোপের অন্ধ প্রয়াসেব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দলিল যথাক্রমে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ এবং অটলবিহারী। বৃহত্তর ঐতিহাসিক নজিরের জগতে প্রবেশ করা বর্তমান উপলক্ষে সম্ভব নয়,—আবশ্যিকও নয়। কেবল অনুভব করতে হয়, বাংলা ভাষা-মাধ্যমে রামমোহনের প্রথম রচনাটিই বাঙালি মানসিকতার সেই উন্মূলন সম্ভাবনার বিরোধে সচেষ্ট হয়েছিল। 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনাব উদ্দেশ্য নির্দেশ করে 'ভূমিকা'য় তিনি লিখেছিলেন[১৫] "....ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন ‧জে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় [,] এমতরূপ সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।"

'অতিপূর্ব পরম্পরা এবং বুদ্ধির বিবেচনা'কে একত্র সমন্বিত করতে পারার এই সাগ্রহ প্রয়াস নবজাগরণেব বাঙালি মানসিকতা এবং বাংলা-সাহিত্যে এক নূতন প্রবণতার সঞ্চার করেছিল,—অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে বঙ্কিম-রামেন্দ্রসুন্দর অবধি তার প্রসার; দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথকেই বা এই উত্তর-সূরিতার ধারা থেকে বাদ দিই কি করে?

পূর্বে দেখেছি, 'বেদান্ত গ্রন্থ'-তে রামমোহন কেবল মূল 'ব্রহ্মসূত্র'র অনুবাদ মাত্র করেন নি, আপন 'বুদ্ধির বিবেচনা' মত তার তাৎপর্য নির্দেশও করতে: চেয়েছিলেন। এইভাবেই নবজাগরণ যুগের বুদ্ধিজীবী

১৫ রামমোহন রায়—বেদান্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩।

বাঙালি চেতনায় ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বতন্ত্র চিন্তার যোগসূত্র রচিত হয়ে গিয়েছিল। 'বেদান্তসার' গ্রন্থের অন্ত্যপূর্ব বাক্যে রামমোহন আপন অভীষ্ট প্রকাশ করে লিখেছিলেন[১৬],"....বেদের প্রমাণ, মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা [,] এ-সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এই দুই অক্ষম হয়েন।"

'মহর্ষি' অর্থে এখানে বেদব্যাস, 'আচার্য' শঙ্করাচার্য—এঁদের চিন্তা-ভাবনালব্ধ জ্ঞানের বিভবকে ব্যক্তিগত বিচার সূত্রে গ্রথিত করে নবযুগের নূতন ঐতিহ্যভিত্তিক মনন-পন্থা সূচিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। এই প্রবণতাই নবজাগরণযুগের মননমূলক বাংলা রচনায় স্থায়ী আদর্শের রূপ ধরেছিল। বেদ-এর উৎস পরিচয় নির্দেশ করতে তার অপৌরুষত্ব, 'ঈশ্বর-প্রণীত'-ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করে বঙ্কিমচন্দ্রও অবশেষে লিখেছিলেন,[১৭]"....বেদ যে মনুষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধহয় পাঠকেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমত মীমাংসা করেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।"

বেদের অপৌরুষেয়তা এবং নির্বিচার অভ্রান্ততার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাঁর অনুষঙ্গী সুহৃদমণ্ডলী আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণও করেছিলেন, এ-সব তথ্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাহলেও বেদের ভাবনা ও বিচারের মৌল ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই ব্যক্তিগত যুক্তি-সিদ্ধান্তের অনুসারে সত্যে উপনীত হবার পূর্বাদর্শটি বাংলার মননমূলক সাহিত্যে রামমোহনেরই দান।

পূর্ব আলোচনায় দেখেছি, রামমোহনকে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রাবন্ধিক বলে অবিসংবাদিত স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে।

১৬ তদেব—'বেদান্তসার', পৃ. ৬৮।

১৭ বঙ্কিমচন্দ্র—'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—বেদ', বঙ্কিম রচনাবলী ২, সংসদ সং) পৃ. ৭৭২।

ব্যুৎপত্তি এবং পরিণামী অর্থবিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আজ আমরা যুক্তি-বিচারের পারম্পর্যে 'প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ' মননশীল গদ্য রচনাকেই 'প্রবন্ধ' বলে গ্রহণ করে থাকি। রামমোহন নিঃসন্দেহে বাংলা গদ্যে অনুরূপ রচনাপ্রবাহের পথিকৃৎ। সেটুকুই আসল কথা নয়, বাংলা রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিষয় ও প্রকরণগত দুটি ধারার সূচনা করেছিলেন, নবজাগরণযুগের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য মূলত তারই অনুসরণে বিস্তার ও পরিণতি লাভ করেছে।

বিষয়ের দিক থেকে রামমোহনের আগ্রহ ছিল ঐতিহ্যাশ্রয়ী যুক্তি-মূলক স্বতন্ত্র বিচারপদ্ধতির প্রতি। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রায় সর্বাংশেই শাস্ত্রনির্ভর। শাস্ত্র অর্থে তিনি কোনো পূর্বসংস্কাবেব আনুগত্য স্বীকার করেন নি। পরম্পরাগত চিন্তার পূর্বসূত্র অনুধাবন করে যুগোচিত এবং ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন। ঐ ঐতিহ্যাভিমুখিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই বাঙালির নবজাগরণ সেদিন বাঙালিত্বহীন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পদানত হয়ে পড়তে পারত। দেবেন্দ্রনাথ থেকে বঙ্কিম-রামেন্দ্রসুন্দর পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধে চলেছে এই পূর্বাদর্শের অনুসরণ।

প্রসঙ্গ বিস্তারিত করা আবশ্যিক নয়, কেবল লক্ষ্য করতে বলি 'কৃষ্ণ চরিত্র' কিংবা 'ধর্মতত্ত্ব'-র বক্তব্য উপস্থাপনায় বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনীয় দৃষ্টিকোণ নয় কেবল, পদ্ধতিকেও অনুসরণ করেছিলেন। আর রামেন্দ্র-সুন্দর সেই একই আদর্শ এবং প্রকরণের স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত অনুসরণে এমন কি 'বিচিত্র জগৎ'-এর মত গ্রন্থের বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। আদর্শ অর্থে, আগেই বলেছি, পূর্বাপর শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যেব ভিত্তির ওপরে স্বতন্ত্র মননশীলতার প্রয়োগক্রমে নব নব সত্যের প্রতিষ্ঠা। এবারে প্রকরণের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করে দেখা যাক্।

'ব্রহ্মসংগীত'কেও হিসেবে ধরলে রামমোহনের বাংলায় রচিত গ্রন্থ সংখ্যা পাওয়া যায় ২৮; 'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রিকা এবং 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ও এর অন্তর্ভুক্ত। সংগীতের আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত।

রামমোহনের গদ্য রচনাবলিকে বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিছু তাঁর অনুবাদমূলক রচনা,—'বেদান্ত গ্রন্থ,' 'বেদান্তসার', 'পঞ্চোপনিষৎ,' 'আত্মানাত্মবিবেক' কিংবা 'বজ্রসূচী'র কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। আরো কিছু আছে রামমোহনের মৌলিক রচনা। এই শেষোক্ত পর্যায়ের রচনাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা সম্ভব।—কিছু প্রত্যক্ষত বিতর্কমূলক, যেমন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার','প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'পথ্যপ্রদান', 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার'। 'ব্রাহ্মণসেবধি'র কিছু অংশও তাই। অন্যপক্ষে 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ', 'গায়ত্রীর অর্থ', 'ব্রাহ্মণসেবধি'র কিছু অংশ, 'প্রার্থনাপত্র', 'পাদরি ও শিষ্যসংবাদ', 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'অনুষ্ঠান', 'সহমরণ বিষয়' এবং 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ বিতর্কের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য উপস্থিত নেই। কিন্তু তাহলেও শুদ্ধ তর্কের (logic) যেটুকু মূলভিত্তি, অমিশ্র বিচারবুদ্ধির সেই সচেতন প্রয়োগ রামমোহনের সকল প্রকার রচনারই সাধারণ গুণ ; বস্তুত চিন্তামূলক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম যেমন তাঁর হাতে, তেমনি সেই সাহিত্যকে একটি যুক্তিসিদ্ধ বাতাবরণে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। অনুবাদ গ্রন্থসমূহে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-সমর্পিত স্বতন্ত্র চিন্তার প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লেখ করেছি। বিতর্কমূলক প্রতিটি রচনাতেও আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র হাতিয়ার ছিল তাঁর কাছে যুক্তি-বিচার ; ইংরেজিতে যাকে বলি 'রীজন'। তাছাড়া যেসব রচনায় অপরের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ ছিল না, সেখানেও রামমোহন তাঁর অনেক রচনাকেই কথোপকথনের আকারে বিন্যস্ত করেছেন। বস্তুত 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'-এর গঠনরীতি কল্পিত বিতর্ক-ভিত্তিক। সহমরণ নিয়ে তার সমর্থক ও নিবর্তকের যুক্তি দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখানে তুঙ্গে পৌঁছেছে ; তার ভেতর থেকে অভীষ্ট সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেখকের স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত

উপস্থাপনা ও 'বিচার-কৌশলের বশে। কিংবা 'পাদরি ও শিষ্যসম্বাদ' বিতর্কমূলক না হলেও 'বিচারমূলক'; কথোপকথনের বিন্যাসগুণে লেখকের বক্তব্য সুপ্রতীত হতে পেরেছে। অন্যপক্ষে লেখার আকৃতিতে কথোপকথনের পদ্ধতিও যেখানে অনুসৃত হয় নি, সে সব ক্ষেত্রেও রামমোহন তাঁর বক্তব্যকে বিচার-ভূয়িষ্ঠ গ্রহণীয়তা সমর্পণ করতে চেয়েছেন। 'গায়ত্রীর অর্থ', কিংবা 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' অথবা অপর যে-কোনো গ্রন্থ থেকেই তার প্রমাণ মিলবে।

একালের 'রামমোহন-বিরোধী সমালোচনা[১৮]র পুরোধা' স্বীকার করেছেন,[১৯] "রামমোহনের শ্রেষ্ঠ অবদান—অন্ধসংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা।" এ কেবল তাঁর রচনা কিংবা জীবনাচরণে লভ্য কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমাত্র নয়, নবজাগরণের বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবপদটি এই প্রবণতার সূত্রে বাঁধা হয়েছিল। একদিকে 'শাস্ত্র'-জ্ঞানের জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায়, আর একদিকে পরিশীলিত যুক্তিগ্রাহ্য স্বাধীন-স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ—এই দুই মিলে নবজাগরণযুগের বাঙালির চেতনায় এক দুর্লভ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা এবং বিচারমূলক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছিল। এমন কথা জোর করে দাবি করবার প্রয়োজন নেই যে, এই সব কিছুই রামমোহনের আপন হাতের রচনা। কিন্তু উপযুক্ত আবহাওয়াটি তিনিই গড়ে তুলেছিলেন, এইটুকুই কেবল বক্তব্য। আর তাইতেই মননের বিকাশ পথ প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল,—যার পরিণামে বাংলা সাহিত্যের সকল দিকেই বলিষ্ঠ মনের মুক্তির বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। 'শাস্ত্র' বলতে রামমোহন বেদাদি-নির্ভর ধর্মশাস্ত্রের কথাই বুঝেছিলেন; অন্তত বাংলা ভাষায় তাই নিয়ে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ

---

১৮ এই অভিধাটি রামমোহন বক্তৃতামালার প্রবক্তা আমার পূর্বসূরী সোমেন্দ্রনাথ বসুর বক্তৃতার শিরোনাম ['রামমোহন ও বিরোধী সমালোচনা'] অবলম্বনে গৃহীত।

১৯ রমেশচন্দ্র মজুমদার—'রামমোহন রায়: প্রচলিত ধারণা বনাম ঐতিহাসিক সত্য' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ১/২ সংখ্যা পৃ. ৪৫।

ছিল। তাঁর পরবর্তী স্তরের প্রখরতম ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপন স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধ মতে ও পথে একই প্রকারের আলোচনা-সিদ্ধান্তাদি সহযোগে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যেরও দিগন্ত প্রসারিত করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বগুণেই তাঁর 'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব'-আদি কেবল মননসিদ্ধ রচনা নয়, হৃদয়-সংবাদীও। অন্যপক্ষে তাঁরই সমকালীন প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্ত বিষয়-উপাদানে স্বতন্ত্র হয়েও প্রকরণে রামমোহনের কত সন্নিহিত! রামমোহন-শিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন,[২০] তিনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর আপন সম্বন্ধ অনুসন্ধানে রত, তখনই তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মনস্বী সম্পাদক অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এ নিরত ছিলেন। কিন্তু বাঙালি রেনেসাঁসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কথা অক্ষয়কুমার বাংলা প্রবন্ধে বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রথম অবতারণা করেছিলেন।

এইখানেই পাথুরে তথ্যের সঙ্গে ইতিহাসের সংঘাতের সম্ভাবনা থাকে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, বলা হয়, অপরাপরের সঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং ফেলিক্স কেরি। সে-সবই পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু রেনেসাঁসের ভিত্তি বিশেষ মন ও মনন-প্রবণতার মূলে। সেই ধারায় যুক্তি-ধর্মিতার পরবর্তী স্তর বিজ্ঞানমনস্কতা; এদিক থেকে বাংলা মননশীল প্রবন্ধে রামমোহনের পরবর্তী ধাপ অক্ষয়কুমারে। অথচ এখানেও প্রকরণ সেই অভিন্ন; শাস্ত্রানুশীলন ও ব্যক্তি-স্বতন্ত্র বিচার প্রয়োগে সত্য নিরাকরণের প্রয়াস। 'শাস্ত্র' এখানে ধর্মীয় নয় বৈজ্ঞানিক,কিন্তু বিচার প্রয়োগের রীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিন্ন, আর ভাষা-প্রকৃতিও কত অন্তরঙ্গরূপে সদৃশ![২১]—"কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি

২০ দ্র. দেবেন্দ্রনাথ—'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' (১৯২৭) পৃ. ৭৬।

২১ অক্ষয়কুমার দত্ত—'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' পৃ. ১২৫।

উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদয় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের সুখদুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন তাহারা কেবল ক্লেশের কারণরূপে প্রতীয়মান হয়। বিচারকালে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা অতি সুচারু বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। যাহা সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদায়ক সন্দেহ নাই।"

সেই জটিল বাক্য-বিন্যাস, সেই পূর্বপক্ষ উপস্থাপনক্রমে উত্তরপক্ষ অবতারণার ভারতীয় রীতি,—সেই যুক্তি-বিন্যস্ত বাক্যক্রম! অক্ষয়কুমার তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'; আর উদ্ধৃত অংশটি যে অধ্যায় থেকে গৃহীত তার শিরোনাম 'প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখজনক কিনা তাহার বিচার।' এই 'বিচার'-প্রবণতা,—এই 'র‍্যাশন্যাল অ্যাপ্রোচ'—নবজাগরণের বাংলা সাহিত্যকে প্রাণের রসদ যুগিয়েছে; তার পরিণামী উপলব্ধির গভীরেও ঐ বিচার-প্রবণতার প্রচ্ছন্ন গভীর উৎসার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'র ভাষা ও বিষয় আসলে বিচারশীল মনের সম্বিৎসাকে হৃদয়রসে পরিপ্লুত করেই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। আর তর্ক থেকে দর্শনে—লজিক থেকে ফিলজফিতে—উত্তরণের ইতিহাসই বাংলা সাহিত্যে তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে রামমোহন রচনাবলি থেকে 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলিতে।

আসলে ঐটিই নবজাগরণের সাহিত্যের ধ্রুবপদ—বুদ্ধিজীবী যুক্তিপ্রবণ মানসিকতার ব্যক্তি-স্বতন্ত্র উপলব্ধি-রসে উদ্দীপন। এখানে নবজাগরণের সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা—ঐখানে তার মুক্তি। সীমাবদ্ধতা বৃহত্তর সর্বসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্নতার দরুন; মুক্তি, ব্যক্তিসত্তার অপরতন্ত্র অবাধ অভিব্যক্তি-তে; যার ফলে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' বহুজন-বন্দিত

আধ্যাত্মিক সংগীত হলেও কারো কারো অনুভবে একান্ত যৌবন-প্রেমের গান হতেও বাধা নেই।[২২]

আগে বলেছি, বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের জন্ম গরিমাসচেতন আত্মবিশ্বাসের মূলে। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের সর্বশেষ এবং এক অতিশয় শ্রেষ্ঠ দান 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ'। আবার পাথুরে তথ্যের সংঘর্ষ বুঝি অনিবার্য হয়!

বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল পর্তুগীজ ভাষায় পর্তুগীজ ধর্মযাজকের দ্বারা।[২৩] আসলে সেটি পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষের ভূমিকা। বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ স্বতন্ত্র আকারে প্রথম লেখা হয় ইংরেজি ভাষায়; লেখকও ছিলেন ইংরেজ।[২৭] তারপরেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষায় আর একখানি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন উইলিয়ম কেরি।[২৫] কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম বাঙালি ব্যাকরণকার হিসেবে দীর্ঘকাল রামমোহনের ভূমিকা সর্বজন-স্বীকৃত ছিল। প্রথমে তাঁর ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়; পরে য়ুরোপে চলে যাবার আগে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তারই একটি বাংলা সংস্করণ রচনা করে যান—তারই নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুর বৎসরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

অধুনা (১৯৭০) 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' নামে বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় কুণ্ঠিত 'অনুমান' করেছেন, সেটি ১৮০৭ থেকে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল[২৬] এবং তার রচয়িতা ছিলেন 'সম্ভবত' মৃত্যুঞ্জয়

---

২২ দ্র. Victoria Ocampo—'Tagore on the Bank of the River Plate'—Rabindranath Tagore Centenary Volume (Sahitya Academy) P. 21.

২৩ দ্র. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন (সঃ)—'পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্‌-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।

২৪ দ্র. N. B. Halhed—'A Grammar of Bengali Language.'

২৫ W. Carey—Bengalee Grammar.

২৬ দ্র. তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সঃ)—'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'

বিদ্যালঙ্কার। প্রথমেই সম্পাদক স্বীকার করেছেন,[২৭] "অজ্ঞাতনামা বৈয়াকরণের নাম-কালহীন এই রচনাটিকে বাঙ্গালা 'শব্দবিদ্যা'-র ইতিহাসে ঠাঁই করে দিতে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া অনুমানের উপরও অনেকখানি নির্ভর করতে হয়েছে। আশঙ্কা ছিলো, অনুমানই একমাত্র নির্ভর না হয়। তা হয়েছে কি হয় নি, সে বিচার পাঠকের।"

বিচার-বিতর্কে না গিয়েও উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সম্পাদককে দশ দফা অনুমানই কেবল করতে হয়েছে; এবং দশম দফার উপ-বিভাগ সাকল্যে পাঁচটি।[২৮] আর তারপরেও তাঁর মন্তব্য[২৯] "১৮০৭-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা বলে যে ব্যাকরণখানি এখানে মুদ্রিত হলো সেখানি রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর তুলনায় নিকৃষ্ট।" তা সত্ত্বেও ব্যাকরণখানি ১৮০৭ থেকে ১৮১১-র মধ্যে কোনো বাঙালির দ্বারা লিখিত হয়ে থাকলে বাংলা ভাষাব প্রথম বাঙালি বৈয়াকরণের মর্যাদাটিও রামমোহন হারালেন; ঐখানেই পাথুরে তথ্যের বিজয়। অথচ আলোচ্য সম্পাদকও পরিশেষে মন্তব্য করেছেন,[৩০] "মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় রামমোহনের দৃষ্টি স্বচ্ছতর এবং গভীরতর, বিশ্লেষণও পরিচ্ছন্ন এবং সংহত। বাঙ্গালা ব্যাকরণে অনাবশ্যক বলে বহুপ্রসঙ্গ তিনি বর্জন করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বহু অনাবশ্যক এবং অবান্তর প্রসঙ্গ এনে বাঙ্গালা ভাষার মূল্যবান প্রসঙ্গগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। রামমোহন নিজস্ব ভাষা-বুদ্ধি দিয়ে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্বকে আবিষ্কার করেছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদেশীদের বাঙ্গালা শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাসূত্রে বাঙ্গালা ভাষার কিছু জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন।"

'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' নাম দিয়ে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে,

২৭ তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সঃ) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ—পৃ. ৭।

২৮ দ্র. তদেব—পৃ. ৯-২১।

২৯ তদেব পৃ. ২৩।

৩০ তদেব পৃ. ৫৬।

তার রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয়ই, এমন সিদ্ধান্তের যে-মূল্যই থাক্, উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যেই রামমোহনের অনন্যতার পরিচয়টি স্পষ্ট। আলোচ্য ব্যাকরণটি যদি কোনো বাঙালির লেখা না'ও হয়ে থাকে, অধুনা প্রমাণিত হয়েছে, এটি আসলে উইলিয়ম কেরির ইংরেজি ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ, তাহলেওঐটিই এতাবৎ জ্ঞাত বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ; নাম, 'ভাষা কথাক্রম',[৩১]—তাহলেও বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস চিরকাল স্বীকার করবে, রামমোহনই দেশি-বিদেশী সকল প্রয়াসীর মধ্যেই বাংলা ভাষার প্রথম 'যথার্থ' ব্যাকরণকার ; রবীন্দ্রনাথ যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন[৩২] বাংলা গদ্যের 'প্রথম যথার্থ শিল্পী'।

বস্তুত সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কালগত পূর্বাগতির কোনো স্বতন্ত্র তাৎপর্য নেই। যেমন ক্লার্ক মার্শম্যান অথবা ফেলিক্স কেরি, কিংবা তাঁদেরও পূর্ববর্তী রবার্ট মে[৩৩] বা অপর কেউ বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক বই লিখেছিলেন কিনা, সে নিয়ে প্রত্নজগতে সন্ধান ও বিতর্ক অনিঃশেষ হবেই। তবু প্রথম বিজ্ঞানমনস্কতার সূচক হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্তকে বাংলা ভাষার ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করবে ; একটি বিশেষ বহমান ধারার তিনি নির্মাতা। তেমনি বাংলা উপন্যাসের জগতে প্যারীচাঁদ কিংবা হানা ক্যাথেরীন মলেন্স্-এর 'প্রথমতা'র দাবি নিয়ে প্রত্ন-বিতর্ক অশেষ হলেও আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র অ-পূর্বতা সাহিত্যের ইতিহাসের ভাণ্ডারে অমর হয়ে আছে। সাহিত্যের ইতিহাস ঐতিহ্যেরই অনুসন্ধানী ; বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের ঐতিহ্য—'শাস্ত্র'-নির্ভর ভারতীয় সৃজন-মনস্কতার সঙ্গে নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের

৩১ দ্র. অধ্যাপক মনসুর মুসা 'বাঙলা ভাষায় লেখা প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা পৃ. ৮৩-৯৩। তথা ড. আহমদ শরীফ [সঃ] —'ভাষাকথাক্রম'—বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ' ভাষা সাহিত্য পত্র : প্রথম সংখ্যা বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮০, পৃ. ২-৭।

৩২ রবীন্দ্রনাথ—'চারিত্রপূজা', রবীন্দ্র রচনাবলী ৪, পৃ. ৪৭৭।

৩৩ দ্র. নবেন্দু সেন—'গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' পৃ. ৬৯।

বস্তুত এই প্রত্যয় তাঁর প্রথমাবধিই ছিল ; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'বেদান্তগ্রন্থ'তে ১৮৩০-এর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ দেখি[৩৮] 'জে', 'তদনুজায়ি', 'স্থনিলে', 'পারেণ', এমন কি 'শ্মৃতি', বানানের মধ্যে। অথচ প্রায় এক নিঃশ্বাসে লেখা হয়েছে 'যদি' 'যখন' ইত্যাদি।

তাছাড়া সন্ধি-প্রকরণের অবতারণাই করেন নি রামমোহন তাঁর ব্যাকরণে,—সংস্কৃত ব্যাকরণের বিষয় বাংলা ব্যাকরণে প্রযুক্ত হলে কেবল বিভ্রান্তির সৃষ্টিই হতে পারে,—এই আশঙ্কায়। লিঙ্গ-বচনাদির ব্যাপারেও তাঁর পরিমিতিবোধ সমান প্রখর। আমাদের একালের ব্যাকরণে এই পরিচ্ছন্নতা আয়ত্ত করা সম্ভব হলে বাঙালি পড়ুয়াদের কাছে মাতৃভাষার বিশুদ্ধ চরিত্র অত দুরায়ত্ত হতে পারত না।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সেও কিছু বড় কথা নয়। আলোচনার উপান্তে পৌঁছে সামগ্রিক ছবিটি একবার দেখে নে'য়া যাক্।—রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়-বোধ করেছিলেন, ভাষাকার রামমোহন প্রথম উদ্যমেই 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন বলে ;—এও আসলে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস এবং স্বাতন্ত্র্য-চেতনারই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার। বাঙালির নবজাগরণের মূলে যে বিচারবোধ ও উগ্র স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উদ্ভব ঘটেছিল তার প্রেরণা এসেছিল য়ুরোপীয় মানসিকতার স্পর্শে ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রামমোহন-প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশে 'রীজন'-এর একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিস্তৃত বিবৃত করেছেন।[৩৯] বৃহত্তর দেশকালের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তার বিকাশ সাধনে রামমোহনের ভূমিকাও ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধার। কিন্তু আগে দেখেছি, স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ এবং যুক্তিমনস্কতার প্রতি রামমোহন-মানসের আগ্রহ ছিল নিজস্ব এবং স্বতঃস্ফূর্ত, এদিক থেকে বাঙালির রেনেসাঁস-এর ইতিহাসে তিনি

৩৮ দ্র. 'বেদান্তগ্রন্থ', তদেব—পৃ. ৫-৬।

৩৯ দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য'—প্রথানন্ত গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়।

অনেকটাই পূর্বাগত। এক অর্থে তিনি বাঙালির রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিপুরুষ, সেকথা প্রথম অধ্যায়েই বলেছি। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ব-চেতনার বলেই অ-গঠিত বাংলা ভাষায় প্রথম থেকেই তিনি 'রীজন'-এর পূর্ণ প্রয়োগ করলেন,—তারই আঘাতে-প্রতিঘাতে তাঁর সমসাময়িক কাল সেই প্রচেষ্টায় প্রবর্তিত হল।—সেই ধারা বাংলা গদ্যে ক্রমশ জ্ঞানমূলক সাহিত্যের দৃঢ়ভিত্তিই কেবল রচনা করল না, মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসিকতার বাংলা ভাষা-নির্ভর অভিব্যক্তির বিশেষ রূপরেখাটি তারই প্রভাবে চিহ্নিত হয়ে উঠল; গদ্যে-পদ্যে নবজাগরণের বাংলা সাহিত্যে তারই স্বাক্ষর ধাপে ধাপে বিকশিত। এই অর্থেই রামমোহনকে নবজাগরণের বাংলা সাহিত্যের খনিত্রধারী পথিকৃৎ বলে অভিহিত করেছিলাম। এইটুকুই আমাদের চূড়ান্ত নিবেদন।

আর একটি কথা। কালবাহিত তথ্যপ্রবাহে নিয়তনির্মীয়মান ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহনই যদি ইতিহাসের স্বভাব হয়, খণ্ড-বিচ্ছিন্ন পাথুরে তথ্যের পঞ্জী মাত্র হাতে করে তার পরিচয় লাভ সুসাধ্য নয়—বস্তুত তাকে আবিষ্কার করতে হয় 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া।' বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা সন্ধানের পন্থাটিও অনুরূপ হওয়া চাই, রবীন্দ্রনাথ কেবল ঐ কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন[৪০], তার বেশি কিছু নয়,—

"মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো।
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।"

৪০ রবীন্দ্রনাথ—'ভারতপথিক রামমোহন'—রবীন্দ্ররচনাবলী ১১, পৃ. ৩৮২

পরিশিষ্ট

রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'

বাংলা সাহিত্যের 'নবজাগরণ'-এ রামমোহনের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার অনুসন্ধান সদ্য-সমাপ্ত আলোচনার মূল বিষয় ছিল। পরিশিষ্ট রূপে গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর স্বতন্ত্র পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা পৃথক সংযোজন; তাহলেও সবিশেষ উদ্দেশ্যবহ। ভাষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার কোনো কৌতূহল নেই; আলোচকের যোগ্যতাও সে-বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কেবল পূর্ববর্তী বিস্তারিত বিন্যাসে ইতিহাসের যে-সব জিজ্ঞাসার ছড়ানো উত্তর মিলেছে তাকেই এই একটিমাত্র রচনার মূল্যায়ন সূত্রে প্রতিফলিত করে সংহত স্পষ্ট করে দেখার অবকাশ রয়েছে—সেই সূত্রেই পুরাতন প্রসঙ্গের এই পুনরবতারণা।

পূর্বে বলেছি, রামমোহন ছিলেন বাংলা তথা ভারতেরও 'রেনেসাঁস পার্সোনালিটি', নবজাগরণের মূর্ত প্রতিনিধি। ইতিহাসের বিস্তৃততম প্রেক্ষাপটে এই মূল্যভাবনাকে উপস্থাপিত করেই রবীন্দ্রনাথ হয়ত তাঁকে 'ভারত-পথিক' বিশেষণে অভিহিত করেছিলেন। আমাদের অনুসন্ধান অবশ্য বাংলার জনপদ ও ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রেই একান্ত সীমাবদ্ধ। এই উপলক্ষে দেখেছি, নবজাগরণের যা-কিছু প্রবণতা, ইতিহাসের সহজ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বলেই তা সমকালীন জীবনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল। রামমোহন তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গভীরে সেই উদীয়মান যুগলক্ষণসমূহকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ধারণ করেছিলেন; তাঁর চেতন-অবচেতন কর্মপ্রবাহে নবজাগরণ-যুগের বিচিত্র অস্ফুট অঙ্কুর বিকাশের সুস্পষ্টতা আয়ত্ত করেছে।

বস্তুত এই নিয়েই রামমোহন সম্পর্কিত মূল্যচেতনার যত বিতর্ক,

এবং মতভেদও। এক সময়ে সে ভেদ ছিল তথ্যগত ; এখন আর তা থাকা উচিত নয়।—বরং সুনিশ্চিত তথ্যাবলিকে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করে দেখলে রামমোহনের অবিতর্কিত ঐতিহাসিক রূপটি অনায়াসে প্রকট হয়ে উঠতে পারে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আসলে তারই চেষ্টা করা হয়েছে।

এক সময়ে মনে করা হয়েছিল, রামমোহনকে বাঙালি নবজাগরণ-এর পথিকৃৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঐ সময়ের জীবন-প্রকাশের সকল দিকে তাঁর অপূর্বতা ও নায়কতা প্রতিপাদন করতেই হবে। তাই তথ্যের উজান ঠেলেও অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করা হয়। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই দেখা যায়—হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রথম উদ্যোক্তা, বাংলা গদ্যের প্রথম রচয়িতা অথবা পৃষ্ঠপোষক, বাংলা ব্যাকরণের প্রথম বাঙালি লেখক ইত্যাদি নানা ভূমিকায় রামমোহনকে প্রথমতম এবং প্রধানতম রূপে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ ছিল মাত্রাতিরিক্ত। অথচ ঐসব সিদ্ধান্ত অনেকটাই ছিল যথার্থ তথ্যের পরিপন্থী। তার ফলে অপর কোটিতে সংশয় স্বভাবতই ক্রমশ বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে। অনেকটা নিছক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বশেই পূর্বনির্দিষ্ট নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের অ-প্রথমতা নিষ্পন্ন করেই বাঙালি নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকার যথোচিত মূল্য হ্রাস করে দেখাব প্রবণতা উন্মেষিত হতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ও সুনির্দিষ্ট প্রসারপদ্ধতি নিয়ে রামমোহনের চিন্তা যতই মৌলিক এবং স্থায়ী মূল্যবহ হোক, কেবল হিন্দু কলেজের প্রথম পরিচালক-গোষ্ঠীতে তাঁর নাম উপস্থিত নেই বলে এ-সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক কৃতিত্বের মূল্য কোনো কোনো মহলে অবনমিত বা অস্বীকৃত হতে পেরেছে। কিংবা একসময়ে দাবি করা হয়েছিল, বাংলা হরফে মুদ্রিত বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা শেষ করে লেখক রামরাম বসু নাকি রামমোহনের কাছে তা সংশোধনের জন্য উপস্থিত করেছিলেন। এর চেয়ে অসম্ভব, অসংলগ্ন কষ্টকল্পনা আর কিছুই হতে পারে না। অতএব

কেবল এই বিভ্রান্তির যুক্তিসূত্রেই বাংলা গদ্যবিকাশের ইতিহাসে দাতা রামমোহনের দেউলে দশা ঘটে যেতে পারল। অনেক অ-মূল প্রথম-তার মাঝখানে তাঁর একটা কৃতিত্বই টি্ঁকেছিল,—'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম ব্যাকরণ বলে দীর্ঘদিন এ-বই স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। ইদানীন্তন কালে সে-বিষয়েও প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছে। আগে বলেছি, 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' নামে ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় একটি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন [১৯৭০] এবং অনুমান করেছেন,—(১) সম্ভবত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা ঐ ব্যাকরণটি (২) ১৮০৭-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যপক্ষে রামমোহনের রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রথমে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় ১৮২৬-এ, তার বাংলা প্রতিরূপ প্রকাশের কাল ১৮৩৩, রচনা শেষ হয়ে থাকবে ১৮৩০-এর মধ্যে। অতএব প্রথমতাগুণে তাঁর কৃতিত্বের শেষ পুঁজিটিও বুঝি গেল!

কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূল্য নির্ণয়ে এই কালানুগত যান্ত্রিক মান যে নিছক বিভ্রান্তিকরই পূর্ববর্তী মূল, আলোচনায় সেকথা ব্যক্ত করতে চেয়েছি। ইতিহাসে যুগান্তরের লক্ষণ অঙ্কুরিত হতে থাকে অনেকটা প্রাকৃতিক ঘটনার মত; শুরুতে আপন বাহন সে আপনিই সংগ্রহ করে নেয়। বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের লেখক বলেই রামরাম বসু কোনো স্বতন্ত্র কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না—বরং ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্যের বিকাশ সাধনের শ্রেষ্ঠ গৌরব উইলিয়ম কেরি'র।—ঐ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে হয়ত এক ছত্র বাংলাও তিনি নিজে লেখেন নি। অথচ যে বাংলা গদ্যরূপ-সংগঠনের উদ্ভাবক ও ধারক তিনি ছিলেন, রামরাম সেই পরিকল্পনার ছিলেন বাহক-মাত্র। এই সূত্রেই ইতিহাসের বাহক ও ধারকের তারতম্যের প্রসঙ্গ এসেছিল পূর্বালোচনায়। রামায়ণে জ্যেষ্ঠ দাশরথি বলেই রাম শ্রেষ্ঠ ছিলেন না—রামায়ণীয় জীবন-ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র ধারক; তেমনি পঞ্চ-পাণ্ডবের মধ্যে যুধিষ্ঠির প্রথমতম হলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়ক ক্রমানুসারে

তৃতীয় এবং দ্বিতীয় পাণ্ডব। এই ভাবেই প্রথমকর্মা না হয়েও বাঙালি নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের যেখানে মূল অথবা প্রধান কৃতীর ভূমিকা তাকেই খুঁজেছি আমরা এ-পর্যন্ত। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-সূত্রে এই রহস্যকেই আর একবার সংহততর আকারে যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

রামমোহনের আগে বাংলা ব্যাকরণের চর্চা য়ুরোপীয় এবং বাংলা ভাষায় হয়েই ছিল। এরূপ যে কয়টি উল্লেখ্য রচনার কথা জানা আছে, তার দুটি অষ্টাদশ শতকে লেখা এবং দুটি উনিশ শতকে; এবং সব কয়টিই য়ুরোপীয়ের রচনা। মানোএল দ্য আস্ সুম্প সাম-এর পর্তুগীজ ভাষায় লেখা ব্যাকরণ (১৭৩৪—মুদ্রণ ১৭৪৩), এবং হালহেড্ ও উইলিয়ম কেরির ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণের [যথাক্রমে ১৭৭৮ এবং ১৮০১] কথা আগে উল্লেখ করেছি; তা ছাড়া 'স্কুল বুক সোসাইটি'র পৃষ্ঠপোষকতায় রেভারেণ্ড জে কীথ্-এর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে; নাম 'A Grammar of the Bengalee Language'.

এই শেষোক্ত গ্রন্থটিই কেবল বাঙালি বিদ্যার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছিল সহজ প্রশ্নোত্তরের আকারে। তার অতিরিক্ত যোজনা ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'; বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ এটি; আর ড. মুখোপাধ্যায়ের অনুমান অনুসারে এর লেখকও প্রখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। আগে বলেছি, সুনিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে ড. মুখোপাধ্যায়ের শেষোক্ত অনুমান নিরাকৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম এই বাংলা ব্যাকরণের সঠিক পরিচয় বাংলাদেশে সংগৃহীত হয়েছে এবং তা কৌতূহলজনক।—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভাষাকথাক্রম' নামে বাংলা ব্যাকরণের একটি পুঁথি রক্ষিত আছে। তার[১] "ক্রমিক সংখ্যা হচ্ছে ৩৪৩ই [No. 343 E]

১ ড. আহমদ শরীফ [সঃ] 'ভাষা কথাক্রম' [বাঙলা ভাষায় রচিত

১৩৪/৫ × ৩১/২ ইঞ্চি পরিমিত তুলট কাগজে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে লেখার আটটি করে সারি। হস্তাক্ষর মাঝারি। লিপিকাল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ। লিপির স্থান কোলকাতার খিদিরপুর।" আবার[২] "আলোচ্য ব্যাকরণের পুস্তিকায় রয়েছে: / ভাষাকথাক্রম গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। / মেস্তর উলিএম কেরি সাহেবের রচিত / লিখক শ্রীরমাকান্ত দেব শর্মণ। পুস্তকমিদং স্বাক্ষরঞ্চ। / ইঙ্গরেজি সন ১৮১০ সাল তারিখ ১৬ আগস্ত বাঙ্গলা / সন ১২১৭ সাল তারিখ ১ ভাদ্র শুক্রেবার মোং খিদিরপুর।"

আলোচ্য ব্যাকরণের সঙ্গে কেরির ইংরেজি ব্যাকরণের তুলনামূলক আলোচনা প্রথমে করেছিলেন অধ্যাপক গণেশচরণ বসু[৩]; তাতে বোঝা গিয়েছিল 'ভাষাকথাক্রম' আসলে ১৮০১-এ প্রকাশিত কেরির ইংরেজি ভাষায় লেখা ব্যাকরণের 'বঙ্গানুবাদ'।[৪] ইদানীন্তনকালে মূল 'ভাষাকথাক্রম' পুঁথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।[৫] পরে ঐ গ্রন্থটির সঙ্গে ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'-এর তুলনা করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্র'-তে অধ্যাপক মনসুর মুসা একটি তথ্যগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন,—'বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ' শিরোণামে। এই তুলনামূলক অধ্যয়নের ফল নির্দেশ করে অধ্যাপক মুসা জানিয়েছেন,[৬] "আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, দুটো ব্যাকরণ হুবহু একরকম। পার্থক্য শুধু এই যে, ড. মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিতে পুষ্পিকা নেই; ড. শরীফ সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিতে

প্রথম ব্যাকরণ]': 'ভাষা-সাহিত্য পত্র' জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত—১ বর্ষ। ১সংখ্যা পৃ. ১০।

২ তদেব।

৩ দ্র, G. C. Basu—'Earliest Bengali Grammar written in Bengali'—'Indian Culture, Vol 12, 1945-46 pp 145-58.

৪ দ্র. মনসুর মুসা—'বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ'—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা পৃ. ৮৬।

৫ দ্র. প্রথমোক্ত পত্রিকা পৃ. ১-৫।

৬ দ্র. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ও পত্রিকা পৃ. ৮৬।

পুষ্পিকা আছে এবং তাতে লেখা আছে, 'উইলিয়ম কেরী বিরচিত, ইত্যাদি। এ ছাড়া দুয়েকটি শব্দের বানান, দুয়েকটি বাক্যের গঠন ইত্যাদিতে অকিঞ্চিৎকর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গুণগত, পরিমাণগত কিংবা অর্থগত কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না।[৭] এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, ইণ্ডিয়া আপিসে প্রাপ্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ব্যাকরণটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত নয়; ব্যাকরণটি উইলিয়ম কেরী বিরচিত ইংরেজী ভাষায় লেখা বাঙলা ব্যাকরণের অনুবাদ। ....অধ্যাপক গণেশচরণ বসু তাঁর প্রবন্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, হয়ত বা অনুবাদে মৃত্যুঞ্জয়ের হাত আছে।" কিন্তু এ অনুমানও সংশয়ের অতীত নয়; মৃত্যুঞ্জয়ের ইংরেজি ভাষার জ্ঞান অনন্যসাপেক্ষ অনুবাদ কর্মের উপযোগী ছিল কি না—এ-সব প্রশ্ন অধ্যাপক মুসা-ই উত্থাপন করেছেন।

সে যাই হোক্, ড. শরীফ এবং অধ্যাপক মুসার দাক্ষিণ্যে আমরাও 'ভাষাকথাক্রম'-এর সম্পাদিত রূপ দেখতে পেয়েছি। আর ১৮১০-এর আগে ঐ ব্যাকরণটি যে রচিত হয়ে গিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব 'ভাষাকথাক্রম'ই বাংলায় লেখা এ-যাবৎ প্রাপ্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ; তবে তার অনুবাদক যিনিই হোন্, লেখক উইলিয়ম কেরি নিঃসন্দেহে অবাঙালি।

কিন্তু 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-কার বাংলায় লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণের প্রথম বাঙালি লেখক,—এ-তথ্য যথার্থ হলেও কারো পক্ষেই কোনো গৌরবের বিষয় হতে পারে না; এ তো নেহাৎ কাকতালীয় ঘটনা! আর আসলে অত কিছুর পরেও রামমোহন ঐটুকু কৃতিত্বও দাবি করতে

৭ বর্তমান লেখকও অংশত দুটি গ্রন্থের তুলনা করার অবকাশ পেয়েছেন। তাতে উভয়ের মধ্যে পাঠগত যে প্রভেদ চোখে পড়েছে, তার একটি নিম্নরূপ:— 'ভাষাকথাক্রম'—'ক-কারাদি ম-কারান্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণ পাঁচ করিয়া বর্গ সংজ্ঞা হয়। [প্রথমোক্ত পত্রিকা, পৃ. ৮]। 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'—'ক-কারাদি মকারান্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণ এহারা পাঁচ ২ হইয়া বর্গ সংজ্ঞা হন।" [পৃ. ১]

পারেন না। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের সূত্রে জানা গেছে—[৮] যথাক্রমে ১৮১৮ ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের প্রকাশিত ছুটি পাঠ্য পুস্তিকায় অনুষঙ্গ সূত্রে বাংলা ব্যাকরণের প্রসঙ্গও অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছিল; প্রথম পুস্তিকাটি 'সংক্ষিপ্ত শিক্ষা পুস্তক', এবং অপরটি 'বাঙ্গালা শিক্ষা-গ্রন্থে'র 'বাহুল্যগ্রন্থ'।

এসব নৈসর্গিক প্রয়াসের সুনিশ্চিত চিহ্ন সত্ত্বেও রামমোহনের কৃতিত্বের অ-পূর্বতা অনস্বীকার্য; তিনিই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-লেখক, যিনি ভাষার স্বরূপ ও ব্যাকরণের ব্যাবহারিক তাৎপর্যকে যুগপৎ সামগ্রিক-ভাবে অনুধাবন করে ব্যাকরণ রচনা করে গেছেন।—এদিক থেকে যথা-অর্থে বাংলা ব্যাকরণের তিনি প্রথম নির্মাতা।

'ভাষাকথাক্রম'-এর ভূমিকায় ড. আহমদ শরীফ সঠিক ইঙ্গিত করেছেন,[৯] 'সর্বজনীন ও অর্থগ্রাহ্য' সুঠাম একটি 'গদ্যরীতি' যে-কোনো ভাষার সার্থক ব্যাকরণ রচনার আবশ্যিক পূর্বশর্ত। আসলে গদ্যরূপের গঠন-প্রকৃতির মূলগত পদ্ধতি ও প্রকরণের বিশ্লেষণ সূত্রে ভাষার সাধারণীকৃত পরিচয় পরিস্ফুট করে দেখানোই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য; ভাষার ব্যবহার তাতে সাবলীলতা প্রাপ্ত হয়। আর ভাষার প্রধান দায়িত্ব হল প্রাঞ্জল অর্থবাহিতা। অর্থস্ফূর্তির আবার বিভিন্ন স্তর রয়েছে; শব্দার্থ, বাক্যার্থ এবং ভাবার্থ—ভাষার পক্ষে এ-তিনের পরিস্ফুটন প্রাথমিক দায়িত্ব। ধ্বনিমাত্রই অর্থবাহী হলে তাকে বলি শব্দ। শব্দার্থ স্বতোবিচ্ছিন্ন বলেই কোনো সামগ্রিক তাৎপর্য গড়ে তুলতে অক্ষম; আবার বিচ্ছিন্ন শব্দাবলি পরস্পরের মধ্যে যথাযোগ্য অন্বিত হতে পারলেই সামগ্রিক তাৎপর্যের দ্যোতনা করতে সমর্থ হয়। যেমন বাড়ি, রাম, এবং √যা এই তিনটি শব্দই স্বতন্ত্রভাবে অর্থবাহী,—প্রথম ছুটি যথাক্রমে অবস্থানস্থল ও ব্যক্তির নাম, তৃতীয়টি গমন ক্রিয়ার দ্যোতক। কিন্তু

৮ দ্র. ড. নির্মল দাশ—'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ' [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ, গবেষকের দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত]

৯ দ্র. ড. আহমদ শরীফ—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ. ২

বিচ্ছিন্নভাবে এই শব্দ কয়টি কোনো সামগ্রিক তাৎপর্য নির্দেশ করতে পারে না। কিন্তু 'রাম বাড়ি যায়'—বস্তুত ঐ তিনটি শব্দেরই সংযোজনে গঠিত একটি সামগ্রিক তাৎপর্যবাহী বাক্য। শব্দের অর্থদ্যোতক অন্বয়ের এই প্রক্রিয়া এবং প্রকরণকেই ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করে দেখায় ;—'যায়' স্থলে 'যাই' বা 'যাও' কেন হয় না, কিংবা 'যায় বাড়ি রাম' অথবা অনুরূপ আরো সকল প্রকার বিকল্প বিন্যাস কেন অসংগত, এইসব তথ্যের উপদেশই ব্যাকরণের আসল দায়িত্ব।

অন্যপক্ষে ব্যাকরণের সাহায্যে প্রধানত শব্দ এবং বাক্যগঠনের রীতি-পদ্ধতি—তথা শব্দার্থ এবং বাক্যার্থ প্রকাশের সুষ্ঠু প্রকরণটুকুই অধিগত হয়। তাহলেও সার্থক ব্যাকরণ রচনার জন্য বিচিত্র ভাবগর্ভ একটি বলিষ্ঠ গদ্যভাষার প্রয়োজন আবশ্যিক ; বস্তুত ঐটুকু ব্যাকরণ আলোচনার অটল ভিত্তি। ব্যাকরণের প্রথম কাজ অন্বেষণ এবং তারপরে বিশ্লেষণ। আসলে ধ্বনি আর রূপ নিয়ে ভাষা ; ধ্বনি অর্থগর্ভ হলে শব্দ গঠিত হয়—আর শব্দের অন্বয়ে গড়ে ওঠে বাক্য ও বাক্যার্থ। আবার অন্বয়কে অভীষ্ট অর্থবাহী করার প্রয়োজনে একই শব্দের সঙ্গে নব নব রূপের যোজনা করে তোলা হয়। যেমন আগে দেখেছি মূল ধাতু ছিল √যা, সুষ্ঠু বাক্য সংগঠনের অনুরোধে তা কখনো 'যাও', কখনো বা 'যাই', 'যায়', 'যান' ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করে। ঐটুকু 'যা' ধাতুর অন্বয়-প্রয়োজনীয় বিচিত্র রূপান্তর। কিংবা 'রামকে' 'বাড়িতে' ইত্যাদিও তো শব্দের বিভিন্ন রূপ, সুষ্ঠু অন্বয়বন্ধনে প্রাঞ্জল অর্থবোধের সম্পাদন এসবেরও উদ্দেশ্য ! আর ভাষার সংগঠনে ধ্বনি ও রূপগত প্রয়োগের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণ করে দেখাটাও ব্যাকরণের কাজ। ফলে যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণকার প্রথমে ভাষার ব্যবহার-পদ্ধতি অনুসন্ধান করেন, তারপরে সেই ব্যবহারেরই মূলগত নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখান। এদিক থেকে ভাষার ব্যবহার যত বিচিত্র, সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ হয়, ব্যাকরণকারের ভাণ্ডারে প্রয়োগিক বৈচিত্র্য এবং তৎপ্রভাবিত রীতি-নিয়মের আনুপূর্বিক তথ্য-চরিত্রও ততই সমৃদ্ধিযুক্ত হয়ে উঠতে

পারে। সন্দেহ নেই, পদ্যেরও ব্যাকরণ আছে, আর তার সবটুকুই ছন্দ-অলঙ্কার-সর্বস্ব নয়। পদ্যভাষার অন্বয়ও আসলে গদ্যের অন্বয়-ভিত্তিকে বিচিত্র কলাকৌশলে কখনো প্রসারিত, কখনো কিঞ্চিৎ বিস্রস্ত, শিথিল করে গড়ে ওঠে। অতএব যে কোনো ভাষারই সুষ্ঠু ব্যাকরণ রচনার অনিবার্য ভিত্তি বহুমুখী প্রয়োগে সমৃদ্ধ বলিষ্ঠ-বিচিত্র গদ্য ভাষা-রূপ।

ড. শরীফ তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর তাৎপর্যবহ আলোচনায় স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন 'ভাষাকথাক্রম' রচনার সমকালে বাংলা গদ্যের কোনো সর্বজন-সাধারণ প্রয়োগ-রীতি গড়েই উঠে নি। তাঁর মতে,[১০] "বস্তুত উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের আগে [বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ স্মরণে রেখেও বলা চলে] সর্ববঙ্গীয় তথা সর্বজনীন ও অর্থগ্রাহ্য কোন বাংলা গদ্যরীতি গড়ে ওঠে নি।" এই বিভ্রান্তিমূলক পরিবেশে সুঠাম ব্যাকরণ রচনা সম্ভব ছিল না। 'তবু শিক্ষা দান ও গ্রহণের জন্যে নিশ্চয়ই শিক্ষক-ছাত্রের পক্ষে জরুরী ছিল একটা শব্দকোষ, কিছু আভিধানিক পর্যায়, শব্দপ্রকরণ, পদপ্রকরণ এবং বাক্যপ্রকরণে কারক ও ধাতুবিভক্তির, আর বাচ্যান্তরের কিছু নিয়ম জানা। শিক্ষক নিশ্চয়ই ছাত্রের জন্যে এগুলো তৈরি করতেন।' নিশ্চয়ই যে তা করতেন, এবং কেবল তাই করতেন—রামমোহন পূর্ববর্তী এতাবৎ আবিষ্কৃত সব কয়টি ব্যাকরণেই তার সংশয়াতীত প্রমাণ,—তা সে বাংলা কিংবা অন্য যে-কোনো ভাষাতেই রচিত হোক না কেন।

'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ রামমোহনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, একই প্রয়োজনের তাগিদে ব্যাকরণ লিখতে গিয়েও ব্যাকরণের সর্বকালিক আদর্শ ও তদনুযায়ী বিশ্লেষণের রীতিটিকে তিনি উদ্ভাবিত করে নিয়েছিলেন আপন যুক্তি-প্রোথিত মননশীলতার সহযোগে। তাঁর ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'; প্রথম অধ্যায়ের শীর্ষে নির্দিষ্ট হয়েছে 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'।[১১] তাতে লেখকের অভিপ্রায়টি প্রাঞ্জলতর দ্যোতনা পেয়েছে

১০. তদেব।
১১. দ্র. রামমোহন রচনাবলী [হরফ প্রকাশনী] পৃ. ৩৬৮।

বলে মনে করি। গৌড়ীয় জনপদের একটি সর্বজনীন ভাষা-অবয়বের বিশ্লেষণই ছিল তাঁর মৌল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য রচিত বলে উদ্দেশ্য এবং আয়োজনের তাত্ত্বিক আলোচনার অত্যাগ্রহ স্বভাবতই পরিহার করেছেন লেখক ; কিন্তু প্রয়োগের প্রাঞ্জলতা বশে তা গোপন থাকে নি।

রামমোহনের মত সচেতন বৈয়াকরণের পক্ষে প্রধাম সমস্যা স্বভাবতই ছিল—যে ভাষা গড়ে ওঠে নি, তার ব্যবহারগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় কি করে গড়ে তোলা যায়! তার একটা উত্তরও তিনি নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। বিচিত্র আঞ্চলিকতা-চিহ্নিত শিথিলবন্ধ ভাষার একটি সম্ভাব্য সর্বজনীন ছাঁচ তাঁর কল্পনায় ধরা ছিল, যাকে সাধু বাংলা রূপ বলা হয়েছে পরবর্তী কালে। প্রধানত ভাগীরথী তীরের কথিত ভাষার কাঠামোয় তৎসম প্রয়োগ-নির্ভর একটি লিখ্য বাংলা গদ্যভাষারূপ গড়ে তোলার প্রয়াস ইংরেজ উদ্যোক্তারা প্রথম থেকেই করে আসছিলেন ; উইলিয়ম কেরি এই পরিকল্পনাতে বলিষ্ঠ সমর্থন সরবরাহ করেন। অতএব সাধুভাষার সর্বজনীন চরিত্রের পরিকল্পনা রামমোহনের মৌলিক দান নয়—কিন্তু ব্যাকরণ রচনার সূত্রে যে-ভাষা তখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি, তারই নীতি-নিয়মটুকু তিনি রচনা করতে উদ্যত হলেন ; —অনেকটা রাম না জন্মাতে রামায়ণ রচনার মত। আর এখানেই, কেবল বিন্যাসের মৌলিকতাগুণে নয়, মাতৃভাষা-চরিত্রের সম্পর্কে তাঁর নিবিড় অনুধ্যান ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেখে বিস্মিত হতে হয়। অথচ তিনি ভাষা-পণ্ডিত কিংবা ভাষা-শিল্পী কোনোটাই ছিলেন না।

প্রথমেই তাঁর মৌলিকতা যুগ-সংস্কারের বিভ্রান্তি নিরসনে সচেতন-ভাবে উদ্যত হয়েছিল। বাংলা গদ্যের লিখ্যরূপ গঠন ও তার রীতিপদ্ধতি আবিষ্কারের প্রথম থেকেই এ-ভাষাকে সংস্কৃতের অনুগামী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা বাংলাপ্রেমী ইংরেজ সমাজে বদ্ধমূল হয়েছিল। আর সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা তো সর্বকালিক উৎকর্ষের এক শ্রেষ্ঠ মাত্রা আয়ত্ত-

করে আছে দীর্ঘকাল ধরে।[১১] স্বভাবতই সেদিনের বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিপদ্ধতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠছিল—আজও সে বন্ধন থেকে তার মুক্তি ঘটে নি।

কিন্তু রামমোহন প্রথম থেকেই বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র চরিত্রের প্রতি সুনিশ্চিত অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। প্রত্যেক ভাষার চরিত্র গড়ে ওঠে ধ্বনির উচ্চারণ ও শব্দ-ধাতুরূপের বিশিষ্টতার অনুসারে। আবার বর্ণমালাই যে-কোনো ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের লিখিত প্রতীক। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত অনেক ধ্বনি নানা নৈসর্গিক কারণেই বাংলা ভাষার উচ্চারণে লুপ্ত হয়েছে ঃ—রামমোহন তার মধ্যে দশটি স্পষ্টত নির্দেশও করেছেন।[১২] অধুনাতম বিচারে তাতে আরো সংযোজন সম্ভব, এবং 'নিয়মের ব্যতিক্রম' অনুচ্ছেদে[১৩] রামমোহন তার সম্ভাব্যতা নির্দেশও করেছিলেন। কিন্তু এই সূত্রে তাঁর ব্যাকরণগত নীতি-নির্দেশটুকুই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য ঃ—"গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন ঐসকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।"

কেবল ধ্বনি নয়, রূপ-প্রকরণের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার সংস্কৃত-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ তিনি পুনঃ পুনঃ উত্থাপন করেছেন। একজায়গায় লিখেছেন,[১৪]—"সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সকল যাহা কোষে ও ব্যাকরণে প্রাপ্ত হয় তাহার প্রয়োগ তদবস্থাই ভাষাতে ব্যবহার হয়, যেমন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ; শূদ্র, শূদ্রা ; ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রী। সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধের যে নিয়ম সকল তাহা বাঙ্গালা ভাষা ব্যাকরণে উপস্থিত করা কেবল চিত্তের বিক্ষেপ করা হয়, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে না।" অন্যত্র[১৫] কারক ও বিভক্তির বিশ্লেষণ

১২ দ্র. তদেব পৃ. ৩৬৯। ১৩ তদেব পৃ. ৩৭০।
১৪ তদেব পৃ. ৩৭৮। ১৫ দ্র. তদেব পৃ. ৩৭৫।

সূত্রে করণ বা অপাদান কারকের পৃথক বিভক্তিরূপ নির্দেশ করেন নি; কারণ সংস্কৃতের মত ঐ সব কারকের স্বতন্ত্র কোনো বিভক্তি-চিহ্ন বাংলা ভাষায় উপস্থিত নেই।

অনুধাবন করে দেখলে বোঝা যাবে, রামমোহন অনুভব করেছিলেন যে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতজ উপাদান প্রচুর আছে, এবং তা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করে চলে; বাংলা ভাষার উচ্চারণ কিংবা রূপনির্মাণ-রীতির সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই; কিংবা ঐসব রীতির কাঠামোয় সংস্কৃত ভাষার নিয়ম ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব তাঁর বক্তব্য,—কোষগ্রন্থ কিংবা ব্যাকরণ অবলম্বনে ঐ সব শব্দের নির্ভুল প্রয়োগটুকু জানা হলেই হল, বাংলা ব্যাকরণের কাজ হবে নিছক বাংলা ভাষার ধ্বনি ও রূপপ্রকরণের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করা। বস্তুত রামমোহন তাই করেছেন; তাঁর ব্যাকরণ নীতিগতভাবে বাংলা তদ্ভব শব্দের ধ্বনি-রূপের ব্যাকরণ; সংস্কৃত তথা তৎসম প্রযুক্তির প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে এসেছে, সে কেবল বাংলা ভাষা-চরিত্র নির্ণয়ে প্রাঞ্জলতা বিধানের জন্যই। যেমন আগেও বলেছি, সন্ধিপ্রকরণের কোনো উল্লেখই করেন নি, কারণ তার মূল তৎসম ধ্বনিগুচ্ছের সংযোজনাত্মক, তদ্ভব শব্দে যার অস্তিত্ব নেই। সমাস প্রকরণে 'হাতভাঙ্গা' সমস্ত রূপের সংস্কৃত 'প্রতিশব্দ'[১৬] হিসেবে 'ভগ্নহস্ত' প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, কিংবা তদ্ধিত প্রকরণে[১৭] 'ভালাই' শব্দের সমান্তরালভাবে 'মনুষ্যত্ব'-র উদাহরণও এসেছে।

এইভাবে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উপলক্ষে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যথার্থতাটুকু রামমোহন প্রথমাবধি স্পষ্ট করে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু আসলে ভাষার নিজস্ব রূপ-চরিত্র তো তখনো গড়েই ওঠে নি! আগে বলেছি, রামমোহন যখন বাংলা ভাষা লিখতে গিয়েছিলেন (১৮১৫) কিংবা এমন কি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যখন তিনি রচনা করেছেন, (ইংরেজি সং ১৮২৬-পূর্ব, বাংলা সং ১৮৩০), তখনো বাংলা ভাষার

১৬ দ্র. তদেব পৃ. ৩৮০।

১৭ তদেব পৃ. ৩৭৯।

সর্বজনীন লিখ্য ('সাধু') গদ্যরূপ পরিস্ফুট হতে বাকি। তারই মাঝে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার চেষ্টায় রামমোহনকে কখনো কখনো আদর্শ গদ্যরূপ অনুমান করে নিতে হয়েছে। একটি কৌতুকপ্রদ উদাহরণ দেখি ক্রিয়ারূপের বিবরণে 'নিয়মের ব্যভিচার' নির্দেশ উপলক্ষে[১৮] 'আইসন ক্রিয়ার ইকারচ্যুত' হওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—'আমি আসিলাম, আমি আসিব।' তেমনি 'নির্ধারণপ্রকারের বর্ত্তমান লকারে···· ইকারে চ্যুতি হয় না' এই তথ্যের সমর্থনে উদাহরণ দিয়েছেন—'আমি আইসি, তুমি আইস, তিনি আইসেন।'

এখানে 'আমি আইসি' রূপটি বৈয়াকরণ রামমোহনের নিজস্ব নির্মাণ। উনিশ শতক কিংবা তৎপূর্ববর্তী সাধু বাংলায় 'আইস,' 'আইসেন' ইত্যাদি রূপ সু-প্রযুক্ত। কিন্তু 'আইসি' প্রয়োগ চিরকালই কৌতুকপ্রদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাতেও 'আইস', 'আইসেন' প্রয়োগ থাকলেও এমন কি 'বেতালপঞ্চবিংশতিতে'ই দেখি[১৯]—"বৃদ্ধা কহিল, যদি প্রয়োজন থাকে, বল, আজই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি।" কিন্তু 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হতে তখনো সতের প্রায় দুই দশকের অপেক্ষা ছিল।

প্রচলিত ভাষাকে রামমোহন কত খুঁটিয়ে দেখেছেন, এবং কত নিপুণভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন, সমগ্র ব্যাকরণ জুড়ে তার উদাহরণ অজস্র। একটি চমৎকার নিদর্শন আছে ঐ 'নিয়মের ব্যভিচার' অংশেই[২০] "থাকন ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ লকার যদি অন্য কোন ক্রিয়ার অতীত কর্ত্তার সহিত সংযুক্ত হয় তবে অতীত কালের ক্রিয়োৎপত্তি সন্দিগ্ধ রূপে কহে, যেমন আমি তাহাকে মারিয়া থাকিব, অর্থাৎ আমার অনুমান হইতেছে যে আমি তাহাকে মারিয়াছি।"

অনুরূপ নিবিড় অন্বেষণের ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের ছবি পাই তির্যক

---

১৮ তদেব পৃ. ৪০১।

১৯ বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড [পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি]। পৃ. ১৭।

২০ তদেব পৃ. ৪০১।

কারকের ব্যাখ্যায়[২১] কিংবা অনুসর্গ পদের চারিত্র নির্দেশে।[২২] অথবা 'সমাসের অন্তঃপাতী' পর্যায়ের টি, টা ইত্যাদি ব্যবহার সূত্রেও।[২৩] সন্দেহ নেই, সেই অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে নিজের নিতান্ত মৌলিক ব্যাখ্যার পরিভাষা ও প্রকরণ রামমোহনকে নির্মাণ করে নিতে হয়েছিল; তবু বিস্মিত হতে হয়, স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ লেখার সেই লঘু পরিমণ্ডলে ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েও রামমোহন কি অতুল্য দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি বশে বাংলা ব্যাকরণের সর্বকাল-সাধারণ নীতি-পদ্ধতিটিকে নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এখানে তাঁর ভূমিকা কেবল আবিষ্কারক কিংবা ব্যাখ্যাতারই নয়, কোনো কোনো স্থলে নির্মাতারও। 'আইসি' ক্রিয়ারূপ অথবা কারকাদি বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে সে ভূমিকার স্বরূপ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর পরিচয় রয়েছে 'অন্বয় প্রকরণ'-এ।[২৪] বস্তুত সুষ্ঠু পদান্বয়-জ্ঞানই আদর্শ ব্যাকরণের পরিবেশ্য মুখ্য বিষয়। ঐ সূত্রে রামমোহন 'ভূরি শব্দ সঙ্কলিত বাক্যের উদাহরণ' নিজে রচনা করে দিয়েছেন,—'দুর্ব্বৃত্ত প্রভু ভৃত্যকে আপন ঘরে কিম্বা পরের ঘরে অন্যায় পূর্ব্বক অতিশয় নিগ্রহ করে এবং তাহাকে পশুর ন্যায় বরঞ্চ পশু হইতে অধম জ্ঞান করে।'

—যুগপৎ সরল, যৌগিক এবং জটিল বাক্যের একটি মিশ্র আদর্শ উদাহরণ! রামমোহনের যুগের বাংলা ভাষায় অনুরূপ নিটোল নির্ভুল জটিলাকার দীর্ঘ বাক্য অপ্রাপ্যই ছিল। স্বয়ং রামমোহনের কত সুদীর্ঘ, দৃঢ় যুক্তি-সংবদ্ধ বাক্য বর্তমান আলোচনায় আমরা ব্যবহার করেছি—কিন্তু কেবল নির্দোষ নয়,—এমন সর্বগুণযুক্ত সংহত বাক্য তার মধ্যে একটিও নেই। বৈয়াকরণের দায়িত্ববোধ ভাষা-লেখক রামমোহনের

২১ দ্র. 'নামের রূপ বিষয়ে'—তদেব পৃ. ৩৭৪-৭৫।

২২ দ্র. 'সম্বন্ধীয় বিশেষণ', তদেব পৃ. ৪০৫-০৭।

২৩ দ্র. তদেব পৃ. ৩৮১।

২৪ তদেব পৃ. ৩৮১।

লেখনীতে এক নূতন মাত্রা যোজনা করেছিল; ব্যাকরণ লিখতে বসে ব্যাকরণের আলম্বন ভাষাকে এমনিভাবে তিনি নির্মাণও করেছেন।

এইখানেই রামমোহনের অনন্যতার ভূমিকা, বাংলা ব্যাকরণের প্রথম লেখক তিনি নন নিশ্চয়ই, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থনামা বৈয়াকরণ তিনিই। কালগত পূর্বাপরতা নয়—নবজাগরণের ইতিহাস এক বিশিষ্ট চেতনার উদ্ভাবন ও বিকাশের ওপরে নির্ভরশীল, বুদ্ধিসেবিত যুক্তিমূলক অন্তর্দৃষ্টির আলোকে যার সহজ উৎসার। যেমন বাংলা সাহিত্যের জগতে, তেমনি ব্যাকরণ রচনার এই পরিসরেও রামমোহন ছিলেন সেই চেতনার তুলনারহিত ধারক—এইখানেই তাঁর 'রেনেসাঁস পার্সোনালিটি'র দ্বিতীয়-রহিত ভূমিকা।

এমন দাবি করা আবার চরম নির্বুদ্ধিতা হবে যে, রামমোহন বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ নির্ভুল নিখুঁত ব্যাকরণ রচনা করে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রাথমিক চিন্তায় অসংগতি, কিংবা সংলগ্নতার অভাব ছিলই; তাছাড়া আদ্যন্ত ব্যাকরণ লিখতে পারার উপাদানই তাঁর হাতে ছিল না! —বারে বারে বলেছি, পূর্ণাঙ্গ সর্বজনীন ভাষারূপটি তো তখনো গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া প্রথম বিদ্যার্থীদের জন্য লেখা ঐ প্রাথমিক রচনায় অধিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারার সুযোগেরও অভাব ছিল। সর্বোপরি রাম-মোহনের মনোযোগ দেবার অবকাশ ছিল অপ্রচুর।

তাহলেও মানতেই হয়, বাংলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ পথটি তিনিই খুলে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন; আমরা তবু চোখ বুঁজে থাকি। বাংলা ভাষার দুটো উপাদান; তৎসম, এবং তদ্ভব-দেশী ইত্যাদি। রামমোহন প্রধানভাবে পরোক্ত উপাদানের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ব্যাকরণ লিখেছিলেন—তাঁর মতে ঐ-টুকুতেই বাংলা ভাষার 'নিজস্ব চরিত্র। ভাষার তৎসম সম্পদকে তিনি বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সীমার বাইরে রেখেছিলেন। তখনকার দিনে তাই করা হয়ত যুক্তিসিদ্ধ ছিল। যে পড়ুয়ার সামনে নিজের ভাষার কোনো স্পষ্ট আদল পর্যন্ত নেই, তাকে প্রভাবক ভাষারও রীতি-নিয়ম শেখাতে গেলে বিভ্রান্ত করাই হয় কেবল,

শেখানো হয় না কিছুই। কিন্তু আজ বাংলা ভাষা তার সর্বজনীন অর্থবহ রূপটিকে আয়ত্ত করে বিচিত্র পথবাহী হয়েছে। আজ পুরো ভাষাকে তার দ্বিবিধ উপাদানের বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ও সমন্বিতভাবে আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নূতন বৈয়াকরণের ওপরে বর্তেছে। রামমোহনের সংকেত অনুসরণ করেই সে পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। সে এক পৃথক প্রসঙ্গ। কিন্তু এখানেও আমরা তাঁকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করি নি; তাই মৌখিক রামমোহন-স্বীকৃতির বিনিময়ে আজও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ-রীতির কৃত্রিম চর্বিত-চর্বণ বহুলাংশে চলেছে অবিরাম।

সাহিত্যের বৃহত্তর পটভূমিকায় যেমন, ব্যাকরণ রচনার এই সীমিত পরিসরেও তেমনি—বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের যথার্থ পরিচয়টি নূতন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন আজও অনস্বীকার্য।
